হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়
মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম

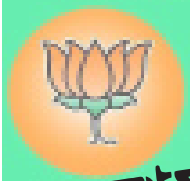

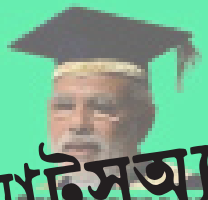

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জ

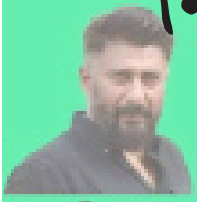

উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
Hoatsapp Biswobidyaloy - Mith O mithyar Pathokrom
জয়ন্ত ভট্টাচার্য

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।।*
গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, বিশ্বেন্দু নন্দ

সম্পাদকমণ্ডলী বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, অর্ক ভাদুড়ি, মহুয়া লাহিড়ী, অর্ণব সাহা, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়,
সোমনাথ রায়, ভবতোষ সরকার, সৌরভ গুহ, রক্তিম ঘোষ, মিলটন বিশ্বাস, সৈয়দ নকিব মাহমুদ, শাজাহান আলি,
ইমরাজ শেখ মির্জা

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, হিন্দমোটর, হুগলি

দাম ১৩০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম

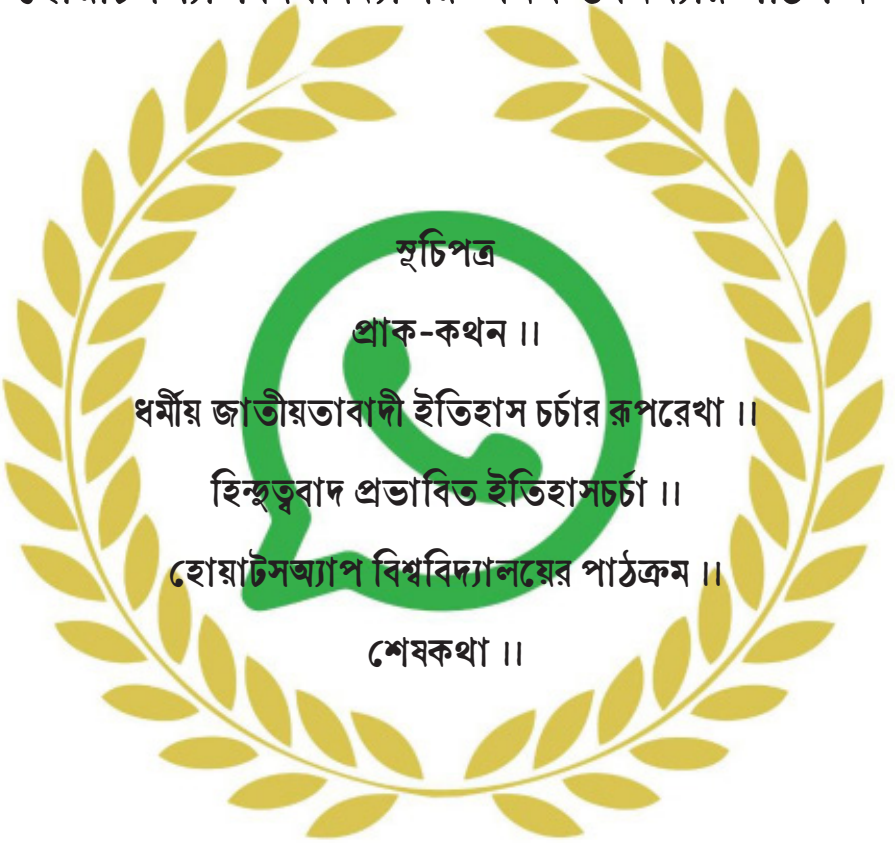

সূচিপত্র

প্রাক-কথন ।।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার রূপরেখা ।।

হিন্দুত্ববাদ প্রভাবিত ইতিহাসচর্চা ।।

হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ।।

শেষকথা ।।

WHATSAPP

UNIVERSITY

LIE LIKE A LEGEND

জনপিন্ডের জাতিবাদী অহংকে, ভূয়া রাষ্ট্রপ্রীতিকে ভোটে রূপান্তরিত করা যায়, ইতিহাস-নিগড় থেকে উঠে আসা বাস্তবের সে জোর নেই।

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা ভাল করেই জানতেন যে, বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গ বাবা-মা চান না যে তাদের সন্তানরা শিখুক তাদের পূর্বপুরুষরা কীভাবে বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ চাপিয়েছিল এবং লুণ্ঠন করেছিল। আমেরিকান রাজনীতিবিদরা জানেন, বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গ পিতামাতা তাদের সন্তানকে শিখতে দেবেন না যে কীভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা ভূমিজ আমেরিকানদের জমি চুরি করেছিল এবং আফ্রিকান আমেরিকানদের দাস বানিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ পিতামাতারা সর্বদা এমন একটি ইতিহাস পছন্দ করেন, যেখানে ইউরোপীয়দের এমন মানুষ হিসাবে দেখানো হয় যারা অ-ইউরোপীয় বিশ্বকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির আলোতে আলোকিত করেছিল। যদিও আমরা বর্তমানে জানি যে, ইউরোপীয়-আলোকায়নের মিথ শুধুমাত্র আংশিকভাবে সত্য।

জনমানসে স্বীকার্য সত্য প্রচলিত শিক্ষায়তনের ইতিহাসবিদরা তাদের কাজের মধ্যে 'বামপন্থী' কুসংস্কার আনেন এবং প্রায়শই 'অ্যাক্টিভিজমের' বেদীতে তাদের একাডেমিক প্রমাণাদির সারাৎসার উৎসর্গ করেন। ইতিহাসের বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নাকি ক্রমাগত শুধুমাত্র ভারতের 'সোনালী' অতীতের অন্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করে। ভারতে বর্তমানে ইতিহাসের ডানপন্থী - পপুলিস্ট (জে সাই দীপক/ আনন্দ রঙ্গনাথন সুলভ) দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র হিন্দু-ভারতের কল্পিত অতীতকে মহিমান্বিত করতে চায়। এই বিবাদের প্রাত্যহিক হোয়াটসঅ্যাপ-সংবহন, ভদ্রবিত্তদের মগজে ধরে রাখা অতীতচিত্রকে প্রকৃতই বিভ্রান্তিকর করে তোলে।

বর্তমান হোয়াটসঅ্যাপ-ঐতিহাসিকরা যুক্তিযুক্ত তথ্যগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন, এবং পরবর্তীতে তাদের এজেন্ডা অনুসারে তথ্যগুলিকে সূক্ষ্মভাবে ঘৃণার মোড়ক দ্যান। ভারতীয় সাইবার-স্ফিয়ারের সঙ্ঘী ট্রোলগুলির পিছনের মুখ আসলে ভারতের নিছক মরিয়া, বেকার যুবকরা যারা এই সহজলভ্য হিন্দি-হিন্দুত্ব-হিন্দিস্থানের আফিম-অহংকারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। এই জেন-জি ট্রোলগুলিকে তুলনা করা যায় কালের মায়াজালে আবদ্ধ পৌরাণিক রাজহাঁসের সঙ্গে - যাদের ক্ষমতা

নেই, জলের মিশ্রণ থেকে দুধ আলাদা করার। অর্থাৎ, তারা সত্যকে কল্পকাহিনী থেকে, ইতিহাসবিদদের সভাকবিদের (এখানে গোদী-মিডিয়া) থেকে আলাদা করতে পারে না - এবং, যারা তাদের চাকরি দিতে পারেনা তাদের থেকে কেবলই পেতে থাকে কৃত্রিম গণশত্রুর তালিকা (নেহেরু, অক্ষম পাকিস্তান, শহুরে নকশালপন্থী ইত্যাদি)।

হিন্দু-অতীতের গর্বে বলীয়ান হয়ে রামরাজ্য-গঠনের আকাঙ্ক্ষার রাজনৈতিক বাস্তুতন্ত্রের পারস্পরিক সংবহনে (হোয়াটসঅ্যাপ ফরোয়ার্ডে) মূল্যবান তথ্যের কয়েকটি বাঁকানো টুকরো দিয়ে তারা অতীতকে জানার অক্ষম প্রচেষ্টা চালায়। এর বিপরীতে আমাদেরও কান দেওয়া উচিত, পারম্পরিক ধর্মীয় আখ্যানগুলি থেকে সমাজ-সত্য আহরণের পাল্টা চেষ্টায়, ইতিহাস-লিখনের পদ্ধতিতে মতামত থেকে তত্ত্ব ও তথ্য আলাদা করায়। আমাদের সেই রাজনৈতিক-লিখন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যার মাধ্যমে সাম্প্রতিকতম বাহাসের দর্পণে এযাবতকালের জাতিরাষ্ট্রপ্রেমী ইতিহাসের নির্মাণ, বিনির্মাণ এবং পুনর্গঠন করা যায়।

২০১৮ সালে, রাজস্থানের কোটায় ভারতীয় জনতা পার্টির সোশ্যাল মিডিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি অমিত শাহ বলেছিলেন, তাদের কাছে যে কোনও বার্তা ভাইরাল করার প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে, সে আসলই হোক বা নকল। দৈনিক ভাস্কর পত্রিকায় অমিত শাহের ভাষণের উদ্ধৃতি ছিল - 'সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই আমাদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকার গঠন করতে হবে। আপনারা বার্তা ভাইরাল করা চালিয়ে যান। আমরা ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশে ৩২ লক্ষ লোকের সাথে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছি; প্রতিদিন সকাল ৮টায় তাদের একটি করে বার্তা পাঠানো হয়...আমরা জনসাধারণের কাছে যে কোনো বার্তা দিতে সক্ষম, তা মিষ্টি হোক বা টক, নকল হোক বা আসল। আমরা এই কাজটি করতে পারি কারণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ৩২ লাখ লোক রয়েছে। এভাবেই আমরা যেকোন বার্তাকেই ভাইরাল করতে পেরেছি।'

সুতরাং, এই ডিজিটাল সংবহনের রাজনীতিকে বোঝার একটি ধাপ হিসাবে এই পুস্তিকার আগমন ঘটলো। জ্ঞানগঞ্জ চর্চাদল আগামীতেও এই আলাপ আরো বিস্তৃত পরিসরে চালাবে।

ধন্যবাদান্তে,
অত্রি ভট্টাচার্য

ব্যাক-কভার

WEB OF LIES

693 pro-BJP, 156 pro-Cong groups and WhatsApp groups supporting regional parties and religious bodies were analysed from August 1 to December 4, 2018

- Fake images of ABP News shared in pro-Congress groups to target PM Narendra Modi and the BJP

- The most shared image in the pro-BJP groups was this Times Now screengrab about Cong's Telangana manifesto

- Communal polarisation was the major theme of anti-Congress misinformation targeting the Gandhi family, aiming to establish that the Congress only cares about Muslims

- A fake screengrab attributing false statements to Congress president Rahul Gandhi

রোজ সকালে উঠে মোবাইল হাতে নিয়ে পরিচিত হোয়াটসঅ্যাপ গোষ্ঠীগুলিতে গেলেই বিভিন্ন ভাষায় বেশ কিছু বহুবার ফরওয়ার্ড হয়ে আসা এবং একই রকম ভাবে লেখা মেসেজ দেখা যায় — তাদের বিষয়ও প্রায় এক। এই সব মেসেজ পড়লে দেখা যায়, এদের অজ্ঞাত বা অপরিচিত লেখকগণ এক মহান দায়িত্ব পালনের কাজ নিয়েছেন। এত দিন পর্যন্ত আমাদের নাকি সব কিছু ভুল শেখানো হয়েছিল আর ভুল বোঝানো হয়েছিল, তাই তাঁরা ভুল সংশোধন করে যথাযথ শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। এক কথায়, তাঁরা হোয়াটসঅ্যাপে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক নিযুক্ত করে, দেশের সবাইকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তবে হোয়াটসঅ্যাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নামহীন অধ্যাপকদের লেখার বিষয়বস্তু খুবই সীমাবদ্ধ। এঁদের কখনও বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন আবিষ্কার নিয়ে লিখতে দেখা যায় না, দর্শন বা সাহিত্য নিয়েও এঁদের বিশেষ আগ্রহ নেই। এঁদের শিক্ষাদানের এলাকা মূলত ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মাঝে মাঝে এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয়ে যায় নানা অবৈজ্ঞানিক বা ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কারের সম্ভার।

আজ একদিকে যেমন ভারতের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের কাছে পৌঁছে

গিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মোবাইল ফোন আর সুলভ আন্তর্জাল (ইন্টারনেট), তেমনই অন্যদিকে আজও ভারতের বর্তমান প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার অধিকাংশই হয় প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার বিশেষ সুযোগ পাননি অথবা তাঁরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। ইতিহাস, অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে তাঁদের জ্ঞান বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত, এবং কাজের জন্য প্রয়োজন না হওয়ার ফলে সেই জ্ঞানেরও খুব বেশি তাঁদের আর স্মরণে নেই। ফলে, তাঁরা খুব সহজেই হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্রহী ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। হোয়াটসঅ্যাপে বার বার বিভিন্ন অজ্ঞাত লেখক যখন একই বিষয় নিয়ে একই কথা লেখেন, তখন সেই তথ্যগুলি সত্য বলেই তাঁদের মনে হয়। অনেক সময় তাঁদের মনে হয়, ঠিক যেন তাঁরই মনের কথা বলেছেন সেই লেখক। ভালো লাগা লেখা তাঁরা ফরওয়ার্ড করে দেন আত্মীয়, বন্ধু বা সহকর্মীদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে – ছড়িয়ে পড়ে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট, এক সময় হয়ে যায় ভাইরাল।

হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না জানা অধ্যাপকদের গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ তাঁরা যে সব মিথ বা মিথ্যা তথ্য উল্লেখ করেন, তার পিছনে যে বহু দিনের পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা রয়েছে তাকে কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না।[১] বহু সংখ্যক বুদ্ধিমান ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ পরিকল্পনার ফসল এই রচনাগুলি। আমরা জানি, বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই কিছু সত্যের সঙ্গে অনেক মিথ আর মিথ্যাকে মিশিয়ে কীভাবে প্রোপাগান্ডার মাল-মশলা তৈরি করতে হয়, সে বিষয়ে সারা বিশ্বে যথেষ্ট গভীরভাবে চিন্তা করা হয়েছে। আজকের ভারতের হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখকদের পিছনে যাঁরা আছেন, তাঁদের গবেষণামূলক কাজকে লঘুভাবে দেখার কোনও অর্থ নেই। এঁদের একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করার চিন্তাকেন্দ্র (থিংকট্যাংক) বললে অত্যুক্তি হবে না।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ভারতের বাংলা, বোম্বাই (বর্তমান মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও কর্ণাটকের অংশবিশেষ), পাঞ্জাব (বর্তমান পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য ও পাকিস্তানের পাঞ্জাব) ও যুক্তপ্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড) 'ধর্মীয় সংস্কার' বা 'ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থান' আন্দোলনগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত জাতীয়তাবাদের যে ধারণার উন্মেষ ঘটে, বিশ শতকে সেই চিন্তাধারা ক্রমশ সারা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপ্তি লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক উপাদান প্রায় প্রথম থেকেই ছিল ধর্ম। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ব্রিটিশ ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কট্টরবাদী রূপ হিন্দুত্ববাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। উনিশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্বানদের চিন্তনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস নিয়ে মিথ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের শাসকদের ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় ইতিহাসের কাল বিভাজনের ধারণাকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা আত্মসাৎ করেন। ভারতের স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক দশক ধরে ক্ষমতাসীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাংবিধানিক বা পৌর জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রসারের চেষ্টা হলেও, আজ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রবল দাপটে সেই ধারণা ভারতের সাধারণ নাগরিকদের মানসপট থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই কারণেই, আজকের ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রমের এত রমরমার কারণ সম্পর্কে বোঝার জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামল থেকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানের ইতিহাসের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

উনিশ শতকের গোড়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত হওয়ার আগে দেশজ শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত উচ্চবর্গের বিদ্বানদের তৎকালীন ইতিহাস ভাবনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাসকদের ইতিবৃত্ত থেকে পুরাকথাকে পৃথক করার কোনও প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের উচ্চবর্গীয় বিদ্বৎসমাজ তৎকালীন পাশ্চাত্য ইতিহাস ভাবনার প্রভাবে পুরাকথা থেকে ইতিহাসকে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু, উপনিবেশিক ভাবনার প্রভাবে ঐতিহ্যগত মৌখিক ইতিবৃত্ত আর মিথের মধ্যে পার্থক্যকে তাঁরা সেই সময় খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাননি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ আর উপনিবেশিক শাসকদের চিন্তনের প্রভাবে ব্রিটিশ ভারতের বিদ্বানদের ইতিহাস চিন্তায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ যুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে, নিম্নবর্গের ঐতিহ্যগত মৌখিক ইতিবৃত্তগুলিকে অগ্রাহ্য করলেও অন্ত-মধ্যযুগ পর্যন্ত উচ্চবর্গের সৃষ্ট মিথ বা তার পরবর্তীকালে উপনিবেশিক শাসকদের সৃষ্ট মিথকে ইতিহাস হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। আজকের হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আসল শিক্ষাগুরু উনিশ ও বিশ শতকের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ। বিংশ শতকের বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কয়েকজন বিদ্বান তাঁদের পৌর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিরুদ্ধে কিছু বিরোধিতা করলেও, মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসচর্চাকে মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও রাজবৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার ফলে তাঁরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেননি।[২] এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার পর শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পৌর জাতীয়তাবাদের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতের কিছু যুক্তিবাদী গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণকারী ইতিহাসবিদরাও কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষত

মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে, অত্যন্ত খেলো যুক্তির অবতারণা করেছেন, যা তাঁদের বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস চর্চার মূল্যবান গবেষণাকে ম্লান করে দিয়েছে। এর ফলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধারণায় বিশ্বাসী লেখকদের সুবিধা হয়েছে, 'আমাদের ইতিহাস, ওদের ইতিহাস' বলে প্রচার করার।

ভারতের স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশকের মধ্যেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি বুঝতে পারে, ভারতের নতুন শাসককুল কেন্দ্রীয় স্তরে ক্রমশ পৌর জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করছে এবং পাঠ্যপুস্তকগুলিতে সেই ধারণার প্রতিফলন দেখা যেতে শুরু করেছে। কিছুটা যুক্তিপূর্ণ গবেষণার প্রতিভাসও কেন্দ্রীয় স্তরের পাঠক্রমে দেখা যাচ্ছে। যদিও অধিকাংশ রাজ্যের বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম তখনও উপনিবেশিক প্রভাব থেকে একেবারেই মুক্ত হতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের মাধ্যমে মূলত বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে লেখা ইতিহাসকে মিথ্যা বলে প্রচার করতে শুরু করে এবং 'সত্য ইতিহাস' প্রচার করতে শুরু করে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ধারণাকে জনপ্রিয় করার জন্য মিথ ও মিথ্যাকে সত্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ইতিহাস বলে প্রচারের জন্য প্রায় সব ভারতীয় ভাষায় এই ধরনের 'সত্য ইতিহাস' রচনার পালা শুরু হয়। এই 'সত্য ইতিহাস' রচনার মূল লক্ষ্যগুলির মধ্যে ছিল প্রাচীন যুগ বা আদি-মধ্যযুগের ভারতীয় উপমহাদেশে কাল্পনিক ধর্মীয় অনুষঙ্গযুক্ত কাহিনির প্রচার ও অন্ত-মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে বাস্তব বা কাল্পনিক ধর্মীয় বিরোধের কাহিনি খুঁজে এনে তার বিবর্ধন। পুরুষোত্তম নাগেশ ওক (১৯১৭-২০০৭) আমাদের সবচেয়ে পরিচিত এই ধরনের 'ইতিহাস' বইয়ের লেখক। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনদের নিজস্ব পত্রিকা 'অর্গানাইজার' ও 'পাঞ্চজন্য' ছাড়া গোরখপুরের গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত 'কল্যাণ' এবং আরও কিছু পত্রিকাও এই কাজে নেমে পড়ে। ১৯৬৭ সাল থেকে অনন্ত পাই (১৯২৯-২০১১) শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ভারতের 'গৌরবময় ইতিহাস'কে জনপ্রিয়

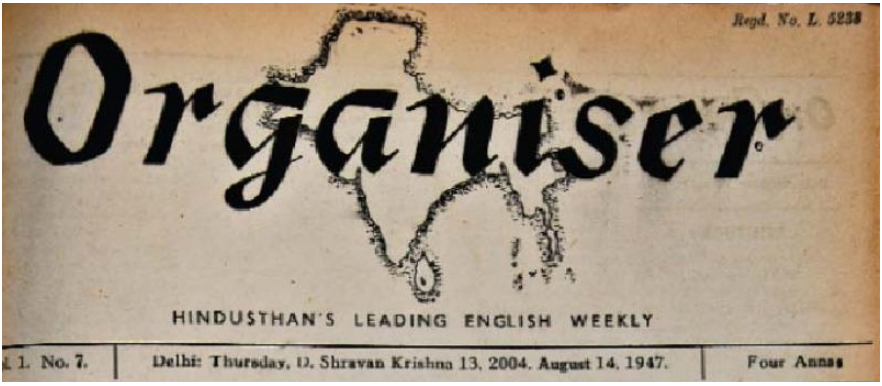
Regd. No. L. 5238

Organiser

HINDUSTHAN'S LEADING ENGLISH WEEKLY

Vol. 1. No. 7. | Delhi: Thursday, D. Shravan Krishna 13, 2004. August 14, 1947. | Four Annas

করতে তাঁর 'অমর চিত্র কথা' সিরিজের বইগুলি কমিক স্ট্রিপের আদলে লিখে প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই সিরিজের বেশ কিছু বইতে পুরাকথা, কল্পিত ইতিহাস ও অর্ধসত্য তথ্যের মাধ্যমে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ ভারত সরকার 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টরিক্যাল রিসার্চ' নামে ইতিহাস গবেষণার জন্য একটি সংস্থা গঠন করে এবং ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মাকে এই সংস্থার সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। সম্ভবত এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ১৯৭৩ সালে ইতিহাসকে নিজেদের মতো করে পুনর্লিখনের জন্য তাদের প্রচারক মোরোপন্ত পিংগলের নেতৃত্বে 'অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা' নামের একটি সংগঠন গঠন করে।[৩] ১৯৯৪ সাল থেকে এই সংগঠন দিল্লি থেকে 'ইতিহাস দর্পণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। বিগত প্রায় এক শতক ধরে লেখা এই বই ও পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাগুলি উল্টে দেখলে আজকের হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের আঁতুড়ঘরের সন্ধান পাওয়া যাবে।

১৯৭৭ সালে স্বল্পস্থায়ী জনতা দল সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতার আসার ফলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা প্রথম ভারত সরকারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এর কিছু দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্তরের বিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু হয়। ঐ বছরের ২৮ মে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের মুখ্য সচিব শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দকে একটি নোট লিখে জানান, কয়েকটি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের 'বিতর্কিত ও পক্ষপাতমূলক অংশ' পাঠকদের 'ভারতের ইতিহাস নিয়ে একটি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি' অর্জন করার দিকে চালিত করবে। তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন যে শিক্ষা মন্ত্রক এই বইগুলি, বিশেষত, এর মধ্যে যেগুলি

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের জন্য লেখা, সেগুলি প্রত্যাহার করার কথা বিবেচনা করতে পারে। এই নোটে শিক্ষা মন্ত্রককে এই পাঠ্যপুস্তকগুলির সমতুল্য প্রকাশনাগুলিকেও একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরীক্ষা করে যাতে পাঠকরা ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে ভুল ধারণা লাভ না করে তা সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতেও বলা হয়। এই নোটটি সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে যায়। যে চারটি বই নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতর্ক শুরু হয়, সেই বইগুলি হলো জাতীয় শিক্ষাগত অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এনসিইআরটি) প্রকাশিত রোমিলা থাপারের লেখা সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া' (১৯৬৭), বিপন চন্দ্রের লেখা দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'মডার্ন ইন্ডিয়া' (১৯৭১), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত বিপন চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি ও বরুণ দের লেখা 'ফ্রীডম স্ট্রাগল' (১৯৭২) এবং রোমিলা থাপার, হরবংস মুখিয়া ও ও বিপন চন্দ্রের লেখা 'কমিউনালিজম অ্যান্ড দ্য রাইটিং অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' (১৯৬৯)। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে রাম শরণ শর্মার লেখা এনসিইআরটি-র একাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'এনশ্যেন্ট ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হওয়ার পর এই বইটিও পাঠ্যপুস্তক বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়। মুখ্য সচিবের নোটের বক্তব্য পড়লে বোঝা যায়, এই বইগুলির বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃতির নয়, মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ না করার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মীয় বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ইংরেজি ও হিন্দি সংবাদপত্রে ও সংসদে এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে রাম শরণ শর্মার লেখা 'এনশ্যেন্ট ইন্ডিয়া' পাঠ্যপুস্তকটিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড প্রত্যাহার করে নেয়। এর আগেই, ১৯৭৭ সালের ২৬ এপ্রিল ভারত সরকার রামশরণ শর্মাকে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টরিক্যাল রিসার্চ'-এর সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং ঐ পদে নিয়োগের জন্য ঐতিহাসিক কালী কিঙ্কর দত্তের নাম প্রস্তাব করার পর প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮ সালের ১০ এপ্রিল অনন্ত রামচন্দ্র কুলকর্ণিকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতায় আসার পর ভারত সরকার ১৯৮১ সালের ১১ এপ্রিল নীহাররঞ্জন রায়কে এই পদে নিযুক্ত করে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আবার ফিরে আসার পর পাঠ্যপুস্তক বিতর্কেরও অবসান ঘটে।[৪]

এরপর, বিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে, ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকারের আমলে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক পুনর্লিখনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। ২০০২ সালে জাতীয় শিক্ষাগত অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এনসিইআরটি) চারটি নতুন ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে – মাক্‌খন লালের লেখা একাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'এনশ্যেন্ট ইন্ডিয়া', মীনাক্ষী জৈনের

(*টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক গিরিলাল জৈনের কন্যা, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সঙ্ঘ পরিবার দিল্লিতে ক্ষমতা দখলের পর ২০১৪য় মীনাক্ষীকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চএর সদস্য। ২০২০তে পদ্মশ্রী। দার্শনিক মার্থা নাসবাউমের ভাষায় মীনাক্ষী অপেশাদার ঐতিহাসিক, ইতিহাসের চলনকে ভালত্বের প্রতিনিধি হিন্দু আর মন্দের মুখ মুসলমানের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে দেখেন; সূত্র Martha Craven Nussbaum, (2007). The Clash Within : Democracy, Religious Violence, and India's Future* - সম্পাদনা দল) লেখা একাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া', হরি ওমের লেখা নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া' এবং মাক্খন লাল, বাসবী খাঁ ব্যানার্জী, এম আখতার হুসেন ও সীমা যাদবের লেখা ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড'। এই পাঠ্যপুস্তকগুলিতে তথ্যগত ত্রুটি ও উদ্ভাবিত তথ্যের সমাবেশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বেশ কিছু সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালের নির্বাচনে সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার এক মাস বাদে এই পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রত্যাহৃত হয়।[৫]

স্বাধীনতার পরবর্তীকালের শাসকদের পৌর জাতীয়তাবাদের ধারণার অনুসারী ইতিহাসবিদদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভারতের ভূখণ্ডে প্রাচীন যুগ থেকে অন্ত-মধ্যযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত সাম্রাজ্যসমূহের কাহিনিকে একক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের ইতিহাস বলে জনপ্রিয় করা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের ঘটনাগুলিকে সমন্বয়ের কাহিনিমালার অন্তরালে সরিয়ে রাখা। এর বিপ্রতীপে, হিন্দুত্ববাদীরা তাঁদের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তন থেকে একদিকে যে রকম ভারতের সব স্থানিক সংস্কৃতিই একটিমাত্র হিন্দু সংস্কৃতির অংশ প্রতিপন্ন

করার জন্য স্থানিক ইতিহাস চর্চার দিকে জোর দিলেন, অন্যদিকে মধ্যযুগের ধর্মীয় বিদ্বেষের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে সামনে এনে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর ঐতিহাসিক অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্ররোচনা দিতে শুরু করলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদীরা অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানিক সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রতিপন্ন করার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[৬] বিশ শতকের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আদৌ অংশগ্রহণ করেনি, বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিল। স্বাধীনতার পর সেই অভাব পরিপূর্ণ করার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বোম্বাইয়ের রাজ্য সরকারের সহায়তায় গোয়া, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে পোর্তুগিজ শাসন অবসানের জন্য সংগ্রামের মধ্যে তাঁরা ঢুকে পড়েছিলেন।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে ধারণার অন্যতম ঐতিহাসিক ভিত্তি জেমস টডের সৃষ্ট একটি মিথ। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনানায়ক জেমস টড (১৭৮২-১৮৩৫) তাঁর লেখা 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ রাজস্থান' বইয়ের দুটি খণ্ড যথাক্রমে ১৮২৯ ও ১৮৩২ সালে প্রকাশ করেন। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে তিনি দিল্লি ও আজমের অঞ্চলের চাহমান (চৌহান) বংশীয় শাসক তৃতীয় পৃথ্বীরাজকে (রাজত্বকাল ১১৭৭-১১৯২ সাধারণাব্দ) বারবার 'ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট' বলে উল্লেখ করে যে মিথের সৃষ্টি করেন[৭] ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনকালে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রচারের ফলে জনপ্রিয় হাজার বছরের পরাধীনতার মিথ

তারই একটি পরিবর্তিত রূপ।

বিশ শতক থেকে হিন্দুত্ববাদীদের 'সত্যি ইতিহাস' রচনার পরিণামে অন্ত-মধ্যযুগের লেখকদের রচিত কাহিনির চরিত্র থেকে শুরু করে অন্ত-মধ্যযুগের স্থানীয় শাসক, তাঁদের সেনাপতি বা ভূস্বামীগণ পরিণত হয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীতে, কখনও ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসক, কখনও বা উপনিবেশিক শক্তিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বীর যোদ্ধায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের নিম্নবর্গের ক্রমাগত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পরিবর্তনের গুরুত্বকে হিন্দুত্ববাদীরা উপলব্ধি করতে পেরে 'সামাজিক প্রযুক্তিবিদ্যা' নামের একটি রাজনৈতিক কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তারা এমন স্থানীয় নায়কদের 'ইতিহাস' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, যাঁদের কোনও না কোনও ভাবে নিম্নবর্গের কোনও একটি বিশেষ অংশের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়, এই নায়ক কোনও ইসলাম ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ভারতে আন্তর্জাল ও মোবাইল ফোন ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছোটো ছোটো পুস্তিকা, সংবাদপত্র এবং পত্রিকার মাধ্যমে এই 'ইতিহাস'কে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। স্বাধীনতার পর বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে 'দৈনিক জাগরণ'[৮], 'অমর উজালা' সমেত বেশ কয়েকটি হিন্দি সংবাদপত্র উত্তর ভারতে হিন্দুত্ববাদী ভাবনা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। হিন্দি ভাষাভাষীদের মধ্যে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা ও পুরাকথা মিশ্রিত করে নির্মিত মিথের প্রচারে এরা সতত তৎপর। বিগত দশক থেকে বেশ কিছু হিন্দি ও অন্যান্য ভাষার টেলিভিশন সংবাদ চ্যানেলগুলিও হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচার শুরু করেছে।

একুশ শতকের প্রথম দশকের শেষ দিক থেকে ভারতে স্মার্টফোন নামে পরিচিত নতুন প্রজন্মের মোবাইল ফোন বিক্রি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির এই নতুন প্রযুক্তির প্রচারমাধ্যম হিসাবে গুরুত্ব বুঝতে একটুও দেরি

হয়নি। স্বল্প দিনের মধ্যেই এই সংগঠনগুলির তথ্যপ্রযুক্তি শাখা ভারতের সর্বত্র গড়ে উঠতে শুরু করে। এই সংগঠনগুলির আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরাও ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের কাজ শুরু করেন। ২০০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোয়াটসঅ্যাপ নামের সামাজিক মাধ্যমের জন্ম। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে হোয়াটসঅ্যাপ এক শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যম হিসাবে ভারতের প্রত্যন্ত প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে পাঠানো তথ্যের নিরাপত্তা, নমনীয়তা এবং কোনও রকম নজরদারির সম্ভাবনা না থাকার সুবিধার জন্য এই মাধ্যমের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আজ ভারত মার্কিন মেটা প্ল্যাটফর্মস সংস্থার হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবার সবচেয়ে বড়ো বাজার, ২০২৩ সালে ৪০ কোটি ভারতীয় এই সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করেছেন।[৯]

হোয়াটসঅ্যাপ ভারতে পৌঁছানোর স্বল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির তথ্যপ্রযুক্তি শাখার কাছে এই নতুন সামাজিক মাধ্যম তাদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী 'ইতিহাস' প্রসারে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। শুরু হয় ভারতের হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম। ২০১৪ সালের নির্বাচনে জাতীয় গণতান্ত্রিক

জোট জয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর পরিস্থিতির আরও পরিবর্তন হয়। ভারতের নতুন সরকার বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ধারণা অনুযায়ী ব্যাপক পরিবর্তন করতে শুরু করেন। ইতিহাস পুনর্লিখনের নামে ইতিহাস ও মিথের মধ্যে ব্যবধানকে মুছে দিয়ে সমস্ত যুক্তিবাদী ধারণাকে সমূলে উৎপাটন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ক্রমশ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে। বর্তমানের এই নতুন পরিস্থিতিতে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ইতিহাসকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে পুরাকথাকে ইতিহাস বলে প্রচারের কাজে ব্যাপৃত হয়েছে। মিথ, পুরাণ আর কল্পকাহিনির এক অদ্ভুত মিশ্রণ হোয়াটসঅ্যাপ গোষ্ঠীগুলিতে প্রতিদিন 'আসল ইতিহাস' বলে পরিবেশিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমের সাথে সাথে ইউটিউব মাধ্যমের ব্যবহারও ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে 'ইনফ্লুয়েন্সার' নামে পরিচিত যে ব্যক্তিরা বিভিন্ন সংস্থার উৎপাদিত পণ্যকে জনপ্রিয় করার কাজ করতেন হিন্দুত্ববাদী ধারণা প্রসারের জন্য তাঁদেরও সাহায্য নেওয়া শুরু হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মিথ ও মিথ্যার প্রচারের দায়িত্বও হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছে। একদিকে ভারতের অর্থনীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অভাব (২০১১ সালের পর ভারতে আর জনগণনা হয়নি) অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যমের অপ্রামাণিক তথ্যকে সূত্র হিসাবে ব্যবহার করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিথ্যা অর্থনৈতিক খবরগুলি মানুষকে বহুলাংশে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই সুযোগে কিছু সংস্থা সামাজিক মাধ্যমের কিছু জনপ্রিয় লেখককে দিয়ে তাদের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মিথ্যা খবর প্রচার করিয়ে নিজেদের শেয়ারের বাজারদর বাড়িয়ে নেওয়ার কাজও শুরু করে দিয়েছে। ২০১৪ সালে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকার কেন্দ্রে নির্বাচিত হয়ে আসার পর থেকে কল্পিত বা অর্ধসত্য তথ্যের মাধ্যমে সরকারের ভুল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের সমর্থন বা সরকারের অর্থনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগগুলিকে খণ্ডন করার কাজেও হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় সতত সচেষ্ট রয়েছে। ২০১৬ সলের ৮ নভেম্বর ভারত সরকারের বিমুদ্রিকরণ বা নোটবন্দির সিদ্ধান্তের পর সামাজিক মাধ্যমে এর সমর্থনে অনেক কল্পিত কাহিনি প্রচারিত হয়। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে সাড়া জগিয়েছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের সদ্য মুদ্রিত ২০০০ টাকার ব্যাংকনোটের মধ্যে আয়কর বিভাগের সুবিধার জন্য 'ন্যানো চিপ' লাগানোর কাহিনি।[১০]

এখানে, হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ বোঝার জন্য সম্পূর্ণ

আলোচনাটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নিয়ে দেখবার চেষ্টা করা হবে। প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি বোঝার জন্য 'ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার রূপরেখা' অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনা থেকে ইতিহাস চর্চার বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্মাণের চেষ্টা করা হবে। এরপর দ্বিতীয় 'হিন্দুত্ববাদ প্রভাবিত ইতিহাসচর্চা' অধ্যায়ে বিশ শতকে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রভাবিত 'সত্যি ইতিহাস' রচনা ও প্রচারের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করা হবে। সবশেষে তৃতীয় 'হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম' অধ্যায়ে একুশ শতকে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির রাজনৈতিক মেরুকরণের উদ্দেশে সামাজিক মাধ্যমে, বিশেষ করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতে পরিকল্পিত ভাবে মিথ ও মিথ্যার ব্যাপক প্রচার নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। সব শেষে 'শেষকথা' অধ্যায়ে কীভাবে ভারতের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমকেই হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে পরিণত করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করে হবে।

টীকা

১. Amit Schandillia, 'Don't Forward That Text: Separating Myths from History on Social Media'; Gurugram: HarperCollins, 2022.

২. Harbans Mukhia, "Medieval Indian History and the Communal Approach" in 'Communalism and the Writing of Indian History'; New Delhi: People's Publishing House, 1969, pp. 26-27.

৩. Daniela Berti, "Hindu nationalists and local History: From ideology to local lore" in 'Rivista di Studi Sudasiatici, Vol. II'; Firenze University Press, 2007, p. 11.

৪. Lloyd I. Rudolph and Susanne Hoeber Rudolph, "Rethinking Secularism: Genesis and Implications of the Textbook Controversy, 1977-79" in 'Pacific Affairs, Vol. 56, No. 1, Spring 1983'; Vancouver: University of British Columbia, 1983, pp. 15-37.

৫. Lars Tore Flåten, 'Hindu Nationalism, History and Identity in India: Narrating a Hindu past under the BJP'; London and New York: Routledge, 2017, pp. 1-2, 12.

৬. Arkotong Longkumer, 'The Greater India Experiment: Hindutva and the North-

east'; Stanford, California: Stanford University Press, 2021, pp. 178-179.

৭. James Tod, 'Annals and Antiquities of Rajas'than or the Central and Western Rajpoot States, Vol. 1'; London: Smith, Elder & Co., 1829, pp. 68n, 96, 319n, 614.

৮. Sevanti Ninan, 'Headlines from the Heartland: Reinventing the Hindi Public Sphere'; New Delhi: Sage Publications, 2007, p. 17.

৯. Prerna Lidhoo, "WhatsApp's India dilemma: Massive userbase but struggling revenue; what can Meta do?" in 'Business Today, October 29, 2023 [https://www.businesstoday.in/magazine/deep-dive/story/whatsapps-india-dilemma-massive-userbase-but-struggling-revenue-what-can-meta-do-402783-2023-10-20].

১০. "RBI's new Rs 2000 notes do not have a Nano-GPS chip" in 'The Indian Express, November 13, 2016'; [https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/nope-rs-2000-note-does-not-have-a-gps-nano-chip-inside-it/].

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার রূপরেখা

মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য'

জাতি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় নেশনের ধারণা খুব বেশি পুরোনো নয়, তাই, জাতির সঙ্গে যুক্ত জাতীয়তাবাদ, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি ও সেই জাতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্র নির্মাণের রাজনৈতিক চিন্তনের জন্মও খুব বেশি দিন আগে নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক, এই কালপর্বের প্রতীচ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতীচ্য থেকে জাতি-রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের ধারণা ব্রিটিশ ভারতের উচ্চবর্গের কাছে পৌঁছায়। ইউরোপের দেশগুলিতে জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি ছিল ভাষা, সেখানে প্রধানত ভাষার ঐক্যের ভিত্তিতেই জাতি-রাষ্ট্রগুলি গড়ে ওঠে। কিন্তু, ব্রিটিশ উপনিবেশিক পরিমণ্ডলে শিক্ষিত উচ্চবর্গ জার্মান বিদ্বান ফ্রিডরিখ ম্যাক্স মুলার (১৮২৩-১৯০০) ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মকেই জাতি নির্মাণের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে নেন। সম্ভবত, ব্রিটিশ ভারতে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভূত বিভিন্নতার কারণে শিক্ষিত উচ্চবর্গ ধর্মীয় ঐক্যকেই জাতি গঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার কথা ভেবেছিলেন। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ধারণার অন্যতম অঙ্গ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত জাতির গৌরবময় প্রাচীন অস্তিত্বের মিথ। সেই মিথ নির্মাণের জন্য দরকার ছিল ইতিহাস চর্চার। ভারতে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকেই ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনকে বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে যে ইতিহাস চর্চার ধারা শুরু হয়েছিল, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা সেই পথ অনুসরণ করেই যাত্রা শুরু করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাক্স মুলার তাঁর রচনাসমূহে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে অগ্রাহ্য করে 'হিন্দু' বা 'আর্য' ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বেদভিত্তিক একশৈলিক প্রাচীন গৌরবময় সভ্যতার ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের যে মিথ নির্মাণ করেছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম দিককার জাতীয়তাবাদী চিন্তকরা সেই মিথকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে, বিশ শতকের হিন্দুত্ববাদের ধারণার নির্মাণেও ম্যাক্স মুলারের 'আর্য' বিষয়ক ধারণার প্রভাব কম নয়।[১]

বাংলা

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক। তাঁর ১৮৭৫-১৮৭৬ সালে এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লেখা 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি কাল্পনিক ইতিহাস হলেও উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনা থেকে ইতিহাস চর্চার

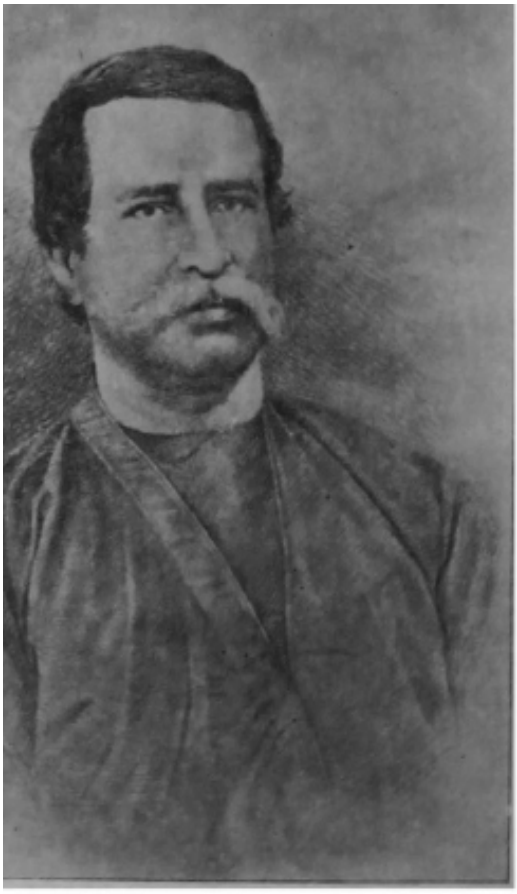

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

স্বরূপ সম্পর্কে বোঝার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। প্রথমে লেখকের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ভাবনার একটি নিদর্শন দেখা যাক। তিনি লিখছেন, "ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহাঁর পর নহেন, ইনি উহাঁদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহাঁর পালিত সন্তান।"[২] ভারত কেবল হিন্দুদের যথার্থ মাতৃভূমি, হিন্দুত্ববাদের এই পরিচিত যুক্তির প্রতিভাস ভুদেবের লেখার এই অংশে স্পষ্টত দৃশ্যমান। ভুদেবের ভাবনার আর একটু পরিচয় দেখা যাক। তাঁর এই কল্পিত ইতিহাসে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের জয়ের পর মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম ভারতের সিংহাসন সাতারার মারাঠা শাসক রামচন্দ্র অর্থাৎ দ্বিতীয় রাজারামকে হস্তান্তর করে অদৃশ্য হয়ে যান। এরপর ভুদেব রামচন্দ্র ও তাঁর পেশোয়া বাজিরাওয়ের কাল্পনিক কথোপকথন বর্ণনা করেছেন, "রামচন্দ্র কহিলেন, "মুসলমান সম্রাটেরা পরধর্ম্মবিদ্বেষী হইতে পারেন, হিন্দুসম্রাটেরা কখনই সেরূপ হইতে পারেন না।" বাজীরাও বলিলেন, "সে কথা সত্য। হিন্দুরা স্বধর্মে ভক্তি করেন, অথচ পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না।"[৩]

শুধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস নয়, উনিশ শতকের বাঙালি উচ্চবর্গের লেখকদের ইতিহাস গ্রন্থ রচনাতেও একই রকম ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী

ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মূলত বাংলায় ভারতের ইতিহাস বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনার তাগিদে বেশ কয়েকজন লেখক 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থে হিন্দুত্ববাদের বীজ কীভাবে অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন।[৪] এখানে, প্রথমে কেদারনাথ দত্তের ১৮৬০ সালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইটিকে দেখব। এই গ্রন্থটিতে পুরাকথা ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য করার কোনও প্রয়াস নেই। এই গ্রন্থে কেদারনাথ দত্ত লিখছেন, "হিন্দুদিগের রাজত্ব কালীন যদিও ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইত এবং যদিও তদ্দ্বারা সাধারণের নানা বিপদ ঘটিত, তথাপি এতদ্দ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম নাশ হয় নাই। কালক্রমে এক সময় উপস্থিত হইল, যখন হিন্দুস্থান রক্তে প্লাবিত হইবে, নগর, পল্লি ধ্বংস হইবে, তীর্থসকল নানা অত্যাচারে সমাকীর্ণ হইবে, দেব মন্দির সকল মৃত্তিকাস্যাৎ হইয়া যাইবে, হিন্দু জাতিরা দাসত্ব-শৃঙ্খল বহন করিবে এবং মোসলমানেরা তাহাদিগের নৃপতি ও প্রভু হইবে।"[৫] আজ থেকে দেড়শো বছর আগে হলেও ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত লেখার এই ধরনটি খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে, তাই না? এবার আসা যাক কয়েক দশক বাদে লেখা, ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হীরালাল চক্রবর্তীর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইটির কথায়। ইনি নিজেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র বলে গ্রন্থের প্রথমে উল্লেখ করেছেন। ইনি ভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে লিখছেন, "অধুনা হিন্দু ও মুসলমান জাতিই ভারতবর্ষের প্রধান অধিবাসী; হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৬/৭ গুণ অধিক। তদ্ ভিন্ন খস, ভিল্ল, পুলিন্দ, সাঁওতাল, রামুসী, গারো প্রভৃতি অসভ্যজাতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে বাস করে। ...ইউরোপীয় পুরাবিৎদিগের মতে খস, ভিল্ল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা এদেশের আদিম নিবাসী।"[৬] দ্বিজাতি নয়, ত্রিজাতি তত্ত্ব, আবার তার সঙ্গে ইউরোপীয় বিদ্বানদের উল্লেখ! তাঁর "রামচন্দ্রই দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভূতার স্থাপনকর্ত্তা।"[৭] মন্তব্যে পুরাকথা ও ইতিহাস মিলেমিশে একাকার, কিন্তু সুর বাঁধা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সপ্তমে। এর পর ভারতের ইতিহাসের কাল বিভাজন নিয়ে তিনি লিখছেন, "অতি প্রাচীন কাল হইতে ১১৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের স্বাধীনতা ছিল। ১১৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা এদেশে রাজত্ব করেন। তদনন্তর ১৭৫৭ অব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজেরা এদেশে রাজত্ব করিতেছেন।"[৮] লক্ষণীয়, হীরালাল চক্রবর্তী ভারতের ইতিহাসের কাল বিভাজন করতে গিয়ে সোজাসুজি সাল-তারিখ দিয়ে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান, তিন ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন।

১৮৯২ সালে চন্দ্রনাথ বসুর (১৮৪৪-১৯১০) লেখা 'হিন্দুত্ব: হিন্দুর প্রকৃত

চন্দ্রনাথ বসু

ইতিহাস' বইটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শিরোনামে বর্তমানে অতি পরিচিত 'হিন্দুত্ব' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, "ইউরোপ যাহাকে ইতিহাস বলে আমাদের তাহা নাই। থাকিলে যে মন্দ হইত তাহা নয়। কোন কোন বিষয়ে ভালই হইত। কিন্তু না থাকিবার দরুণ যে বিষম অনিষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করাও বোধ হয় ঠিক নয়। ইতিহাসের গূঢ়তম কথা মানসিক প্রকৃতি। মানসিক প্রকৃতি যাহাতে পাওয়া যায় না তাহা ইতিহাস বলিয়া উক্ত হইলেও ইতিহাস নয়, ভাটের কাহিনী মাত্র। ইউরোপে যে সমস্ত গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া পরিচিত তাহার অধিকাংশ ভাটের কাহিনী, ইতিহাস নয়। সংস্কৃতে সেরকম গ্রন্থ নাই বলিয়া দুঃখ করিবার কারণ নাই।"[৯] ইতিহাস সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ চিন্তাকে 'ভাটের কাহিনি' বলে নস্যাৎ করার পর, তিনি লিখছেন, "হিন্দুদের সেরকম গ্রন্থ নাই থাকুক, কিন্তু তাহাদের ইতিহাস চাই। অপর সকলের যেমন ইতিহাস আবশ্যক হিন্দুদিগেরও তেমনি ইতিহাস আবশ্যক। কারণ ইতিহাসেই মানুষের উদাহরণ ও আদর্শ থাকে। যে উদাহরণ ও আদর্শ দেখিয়া মানুষ উৎসাহিত, উত্তেজিত ও পরিচালিত হয় তাহা ইতিহাসেই থাকে, অথবা তাহাই ইতিহাস।...সে উদাহরণ ও আদর্শের মূল কারণ, মানসিক প্রকৃতি। তাহার বাহ্যপ্রমাণ আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি এবং সাহিত্য। হিন্দুর সাহিত্যও আছে, আচারানুষ্ঠানাদিও আছে। অতএব যাহাতে হিন্দুর মানসিক প্রকৃতি পাওয়া যাইতে পারে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ আমাদের পূর্ণ মাত্রায় আছে। বোধ হয় অন্যের আমাদের পরিমাণেও বেশী আছে এবং খাঁটিও বেশী আছে।"[১০] চন্দ্রনাথ বসু এখানে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীদের আজও অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে কল্পিত অতীত নির্মাণকে প্রকৃত ইতিহাস বলে চিহ্নিত করতে

চেয়েছেন। সেই কারণেই এরপর তিনি লিখছেন, "কিন্তু এপর্য্যন্ত হিন্দুর ইতিহাসের অনুসন্ধান সাহিত্যে ও আচারানুষ্ঠানে হয় নাই বলিলেই হয়, অন্যত্র হইতেছে। বেশীর ভাগ প্রত্নতত্ত্বেই হইতেছে। কিন্তু, প্রত্নতত্ত্বে প্রাচীনদিগের প্রাণ পাওয়া যায় না, দুই এক খানা ভাঙ্গা হাড় মাত্র পাওয়া যায়। আর প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সেই ভাঙ্গা হাড় গুলার এত শব্দ করিয়া থাকেন যে সেই শব্দের জন্য প্রকৃত ইতিহাসের কথা একেবারেই শুনিতে পাওয়া যায় না। অতএব প্রত্নতত্ত্ব ছাড়িয়া এখন সাহিত্য ও আচারানুষ্ঠানাদিতে ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইবে।"[১১] একুশ শতকের ভারতে যখন হিন্দুত্ববাদীরা প্রত্নতত্ত্বকে পুরাকথা প্রমাণের জন্য নিয়মিত ব্যবহার করছে, তখন এই বক্তব্য আশ্চর্যজনক মনে হলেও, উনিশ শতকের শেষে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উপর ব্রিটিশ সরকারি নিয়ন্ত্রণের কথা মনে রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। চন্দ্রনাথ বসু ইতিহাসের নামে কল্পিত অতীত নির্মাণে তাঁর দুই পূর্বসূরির কথাও এখানে উল্লেখ করেছেন, "পূজ্যপাদ শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অগ্রে এই চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারিয়াছি।"[১২]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী বিদ্বানরা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন গৌরবের ধারণা সৃষ্টির জন্য যেভাবে পুরাকথাকে ব্যবহার করে কল্পনা আশ্রিত প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণ করে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিদ্বানরা সেই মিথের উপরই ভিত্তি করে নিজেদের চিন্তার সৌধ নির্মাণ করেছেন। ভূদেব শিষ্য চন্দ্রনাথ বসুও এই একই পথের পথিক।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাংলায় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ভাবনা কী রূপ ধারণ করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' শিরোনামে ১৯২৬ সালে হিন্দু সভায় প্রদত্ত একটি ভাষণে। পরে, এই ভাষণটি 'হিন্দু-সংঘ' পত্রিকার ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১৯ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে তিনি বলেছেন, "একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।...দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল,

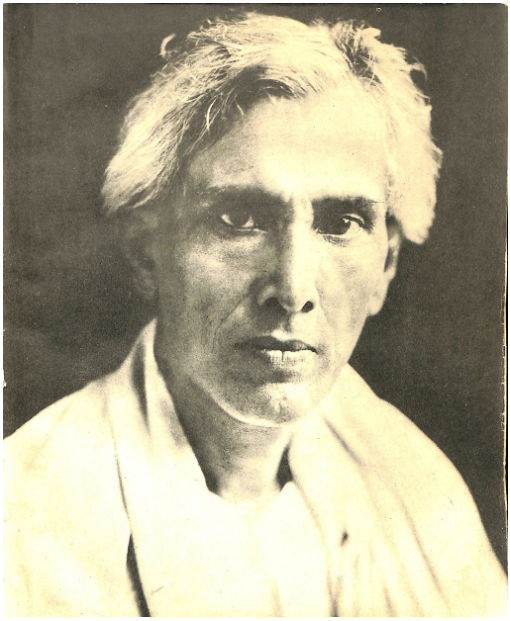

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তিনিও কসুর করেন নাই।”[১৩] তাঁর ইতিহাস ভাবনা যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রসূত, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না, যখন তিনি বলেন, “হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই।... আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়।”[১৪] পশ্চিমবঙ্গে আজও শরৎচন্দ্রের এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রবাহ প্রবলতার সঙ্গে বহমান।

পাঞ্জাব

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার পাশাপাশি ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা ক্রমশ প্রসারিত হতে শুরু করে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে উত্তর ভারতে প্রাক-উপনিবেশিক ধারণাসমূহের বিলোপ ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধারণার প্রসারে আর্য সমাজ আন্দোলনের অবদানকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) হিন্দি ভাষায় তাঁর ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ গ্রন্থটি ১৮৭৫ সালে প্রথম প্রকাশ করেন এবং ১৮৮২ সালে এই গ্রন্থের আর একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই বইয়ের অষ্টম সমুল্লাসে

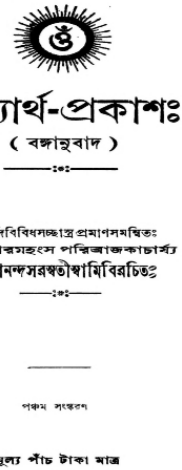
ওঁ

সত্যার্থ-প্রকাশঃ

(বঙ্গানুবাদ)

বেদাদিবিবিধসচ্ছাস্ত্রপ্রমাণসমন্বিতঃ
শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিবিরচিতঃ

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

আশ্বিন, ১৩৫৩।

দয়ানন্দ সরস্বতী

তিনি লিখেছেন, আর্যরা তিব্বত থেকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূখণ্ড আর্যাবর্তে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এই দেশের এর পূর্বে কোনও নাম ছিল না। আর্যদের পূর্বে এই দেশে কেউ বাস করত না, কারণ সৃষ্টির কিছুকাল পরেই আর্যরা এই দেশে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণদেশে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার নাম দেবাসুর সংগ্রাম নয়, কিন্তু রাম-রাবণ বা আর্য-রাক্ষস সংগ্রাম। তাঁর মতে, আর্যাবর্ত ভিন্ন অন্য দেশকে দস্যুদেশ এবং ম্লেচ্ছদেশ বলে। তাঁর মনে হয়েছে, সেই কারণে এখনও নিগ্রোদের (কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকেয়দের) চেহারা যে রকম রাক্ষসদের বর্ণনা আছে সেই রকম ভয়ংকর। তাঁর কল্পনায় ইক্ষ্বাকু আর্যাবর্তের প্রথম রাজা। ইক্ষ্বাকুদের থেকে কৌরব-পাণ্ডবদের সময় পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে আর্যদের রাজত্ব ছিল এবং আর্যাবর্ত ব্যতীত অন্যান্য দেশেও বেদের অল্পবিস্তর প্রচার ছিল।[১৫] দয়ানন্দ সরস্বতীর কল্পিত ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান হিন্দুত্ববাদীদের ভাবনার মিল ও অমিল উভয়ই লক্ষণীয়। ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ গ্রন্থের একাদশ সমুল্লাসে একটি ইন্দ্রপ্রস্থের আর্যাবর্ত দেশীয় রাজবংশাবলি নামে একটি ইতিবৃত্ত উল্লিখিত হয়েছে। দয়ানন্দ সরস্বতী এই ইতিবৃত্তের তথ্যসূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন তত্কালীন উদয়পুর রাজ্যের শ্রীনাথদ্বারা থেকে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত ‘হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা’ ও ‘মোহনচন্দ্রিকা’ পত্রিকার সম্মিলিত সংখ্যার একটি নিবন্ধ, এবং এও জানিয়েছেন, ঐ নিবন্ধের উৎস ১৭৮২ বিক্রম সংবতে (১৭২৫ সাধারণাব্দে) রচিত একটি পাণ্ডুলিপি। এই রাজবংশাবলিতে ৪১৫৭ বর্ষ, ৯ মাস, ১৪ দিন যাবৎ যুধিষ্ঠির থেকে যশপাল পর্যন্ত ১২৪ জন রাজার শাসনকালের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এই ইতিবৃত্ত অনুযায়ী শেষ আর্যরাজা যশপাল (ইনি তালিকায়

পৃথ্বীরাজ চৌহানের পঞ্চম উত্তরপুরুষ) শাহাবুদ্দিন ঘোরির কাছে ১২৪৯ বিক্রম সংবতে (১১৯২ সাধারণাব্দে) পরাস্ত ও বন্দি হন। অতঃপর শাহাবুদ্দিন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হন। তাঁর বংশে ৫৩ পুরুষ ৭৫৪ বছর ১ মাস ১৭ দিন রাজত্ব করেছেন।[১৬] দয়ানন্দের উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের সঙ্গে ১৮০৮ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বাংলা 'রাজাবলী' (বা 'রাজতরঙ্গ') বা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুরের সংস্কৃত 'রাজাবলী' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে এবং অনেকাংশেই এই ইতিবৃত্ত প্রাক-উপনিবেশিক ইতিহাস বোধের সাক্ষ্য বাহক। কিন্তু, দয়ানন্দ সরস্বতী এরপর যখন শাহাবুদ্দিন ও তাঁর বংশধরদের ইতিবৃত্ত লেখা থেকে নিজের বিরত থাকার কথা উল্লেখ করেন, তখন বোঝা যায় পূর্ববর্তী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুরের মতো তিনি আর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত নেই। তাঁর ধর্মীয় বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় এই বইয়ের অন্যত্র, যেখানে তিনি লিখেছেন, "বিনা অপরাধে কাহাকেও হত্যা করা মহাপাপ। যাহারা মুসলমান মত বিশ্বাস করে না মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফির বলে। তাহাদের মতে অবিশ্বাসী রাখা অপেক্ষা হত্যা করা ভাল। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, যাহারা তাহাদের ধর্ম মানে না, তাহাদিগকে হত্যা করা বিধেয়। তাহারা তাহা করিয়াও আসিতেছে। ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা রাজ্য হারাইয়াছে এবং তাহাদের মত ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছে।"[১৭]

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে পাঞ্জাবের আর্য সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাব পরিস্ফুট। ১৯০৯ সালে আর্য সমাজের নেতা লাল চাঁদের উদ্যোগে পাঞ্জাবের হিন্দু সভা গঠিত হয়। ১৯০৯ সালের ২১ ও ২২ অক্টোবর লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট আর্য সমাজী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮) তাঁর ভাষণে বলেন, "এটা হতে পারে যে হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদেরকে আধুনিক অর্থে একটি জাতিতে পরিণত করতে পারে না, তবে এটি কেবল শব্দের খেলা। আধুনিক জাতিগুলি রাজনৈতিক এককসমূহ। একটি রাজনৈতিক একক সাধারণভাবে একটি সর্বজনীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী সব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং একটি রাষ্ট্র গঠন করে। এভাবে বিবেচনা করা হলে জাতি ও রাষ্ট্র বাস্তবিকভাবে বিনিময়যোগ্য শব্দবন্ধ। এই অর্থে এই কথাটি 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' নামের সংস্থার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এটা নিঃসন্দেহে শব্দটির একটি প্রয়োগ, এবং যা সাধারণত আধুনিক রাজনৈতিক সাহিত্যে গৃহীত হয়। তবে এটি একমাত্র অর্থ নয় যেখানে এটি প্রয়োগ করা যায় বা করা যেতে পারে। আসলে জার্মান ভাষায় জাতি কথাটি অপরিহার্যভাবে রাজনৈতিক জাতি বা রাষ্ট্র বোঝায় না, একটি নির্দিষ্ট সভ্যতা ও

সংস্কৃতির অধিকারী সম্প্রদায়কে বোঝায়। এই অর্থে এটি ব্যবহার করলে, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে হিন্দুরা নিজেরাই একটি জাতি, কারণ তারা তাদের নিজস্ব একটি সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে।"[১৮] ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পৌর জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণা যে পৃথক, লালা লাজপত রায় তাঁর এই ভাষণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

পাঞ্জাবের আর এক বিশিষ্ট আর্য সমাজী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মুন্সি রাম বা পরবর্তী কালের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৬-১৯২৬)। ১৯২৪ সালে তাঁর লেখা মূল হিন্দি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত 'হিন্দু সংগঠন: সেভিয়ার অফ আ ডাইং রেস' বইটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি হিন্দু মহাসভার সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রত্যেক বড়ো ও ছোটো শহরে হিন্দু মহাসভার অধীনে একটি হিন্দু রাষ্ট্র মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন। সেখানে ২৫ হাজার লোক ধরে এই রকম একটি প্রাঙ্গণে একটি সভাগৃহ নির্মাণ করে প্রতিদিন ভগবদগীতা, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কথাপাঠের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। হিন্দু রাষ্ট্র মন্দিরে কুস্তির আখড়া ও প্রাঙ্গণে গতকা ও অন্যান্য খেলার ব্যবস্থা করার কথাও তিনি লিখেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, এই মন্দিরে তিন মাতৃশক্তির পূজা হওয়া উচিত – গৌমাতা, সরস্বতী মাতা ও ভূমি মাতা। তিনি আরও প্রস্তাব দিয়েছেন, এই মন্দিরের একটি বিশিষ্ট স্থানে ভারত মাতার প্রাণবন্ত রঙ দিয়ে একটি জীবন্তপ্রতিম মানচিত্র নির্মাণ করতে, যাতে মাতৃভূমির প্রত্যেক সন্তান প্রতিদিন মাতার সামনে শির নত করে যে প্রাচীন গৌরবের চূড়া থেকে তাঁর পতন হয়েছে, সেখানে তাঁকে পুনঃস্থাপিত করার শপথ নিতে পারে।[১৯] তাঁর এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ভাবনা নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাবিত করেছে।

বোম্বাই (মহারাষ্ট্র)

বোম্বাই প্রদেশে, বিশেষত বর্তমান মহারাষ্ট্রে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই উচ্চবর্গের ইতিহাস চিন্তার মধ্যে মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। গঙ্গাধর শাস্ত্রী ফড়কে তাঁর ১৮৫২ সালে প্রকাশিত 'হিন্দুধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের উপসংহার অধ্যায়ে লিখেছেন, "সমগ্র হিন্দুস্থানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৭০০ কোশ, কেবল এই ভূভাগেই হিন্দুদের বাস ও হিন্দুধর্ম বিদ্যমান; বাকি সমস্ত পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম বিরোধীদের বাস; তথাপি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে শক শালিবাহনের পরবর্তী প্রায় ৯০০ বছর পর্যন্ত, হিন্দুস্থানে সবই হিন্দু রাজাদের রাজত্ব ছিল এবং সেই সময়ে হিন্দু ধর্ম চূড়ান্তরূপে সুরক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে, মুসলমানরা হিন্দুস্থানে আসার পর হিন্দুধর্ম কীটদংশিত হয়। মুসলমানদের জবরদস্তির ফলে হাজার হাজার হিন্দু পৃথক হয়ে যায়।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

এরপর পোর্তুগিজরা আসে, তারা গোয়া থেকে বসই প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার হিন্দুকে পৃথক করে দেয়। তারপর, ইংরেজরা আসে, তারা প্রথমে কলকাতা এবং মদ্রাস দখল করে। এই কালপর্বে, শিবাজী এবং পেশওয়ারা পরাক্রম প্রদর্শন করে মুসলমান ও পোর্তুগিজদের পরাভূত করে; কিন্তু তাঁরা ইংরেজদের পরাস্ত করতে পারেননি। পেশোয়াদের আমলে ইংরেজরা কর্ণাটক জয় করেছিল; তথাপি, যতদিন শিবাজি ও পেশোয়ারা ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের উপর কোনও আঘাত আসেনি; সেই কারণে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্ম প্রতিপাদক বেদশাস্ত্র প্রভৃতি যথেষ্ট শক্তিলাভ করেছে। ১৭৩৯ শকাব্দে সমস্ত হিন্দুস্থান ইংরেজ সরকারের অধীন হয়; সেই দিন থেকে হিন্দুস্থানের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী পাদ্রিরা উপদেশের মাধ্যমে হাজার হাজার হিন্দুদের মনকে বিভ্রান্ত করিয়ে, তাঁদের স্বধর্মচ্যুত করে নিজেদের ধর্মে নিয়ে নিয়েছে।”[২০] গঙ্গাধর শাস্ত্রী ফড়কের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ভাবনার সঙ্গে বাংলার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ভাবনার পার্থক্য এখানে পরিষ্কার। পরবর্তীকালেও মারাঠি উচ্চবর্গের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের ভাবনাতে ইংরেজদের হিন্দু শাসককে পরাস্তকারী খ্রিস্টান শাসক বলেই ভাবা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) মারাঠি চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মারাঠি উচ্চবর্গের দৃষ্টিকোণ থেকেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রসারের উদ্দেশে ১৮৯৪ সালে সার্বজনিক গণেশ উৎসব এবং ১৮৯৫ সালে শিবাজি জন্মোত্সব পালনের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর ভাষণ ও রচনায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয়

বাল গঙ্গাধর তিলক

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ১৯০৬ সালের ৩ জানুয়ারি বনারসে ভারত ধর্ম মহামণ্ডলে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, "ধর্ম জাতীয়তার একটি অঙ্গ। ...বৈদিক যুগে ভারত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ ছিল। এ এক মহান জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ ছিল। সেই ঐক্য বিলুপ্ত হয়ে বড় ধরনের অবক্ষয় নিয়ে এসেছে এবং সেই ঐক্যকে পুনরুজ্জীবিত করা নেতাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ...যদি আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত ক্ষুদ্র পার্থক্য ভুলে গিয়ে, এর (ঐক্যের) উপর জোর দিই, তবে ঈশ্বরের কৃপায় আমরা শীঘ্রই সমস্ত পৃথক সম্প্রদায়কে একটি শক্তিশালী হিন্দু জাতিতে একত্রিত করতে সক্ষম হব। এটাই প্রত্যেক হিন্দুর আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত।"[২১] মহারাষ্ট্রের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ভাবনার সবচেয়ে পরিচিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের (১৮৮৩-১৯৬৬) লেখা 'হিন্দুত্ব: হু ইজ আ হিন্দু?' বইতে। তিনি লিখেছেন, "সিন্ধুগণ যে জাতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত স্থাপিত হয় এবং তার ভৌগোলিক চরম সীমায় পৌঁছে যায়, যখন বীর্যবান অযোধ্যার রাজকুমার সিংহলে বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেন, এবং কার্যত হিমালয় থেকে সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডকে একক সার্বভৌম শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন। যে দিন অপ্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য বিজয়ের অশ্ব অযোধ্যায় ফিরে এল, সার্বভৌমত্বের মহান

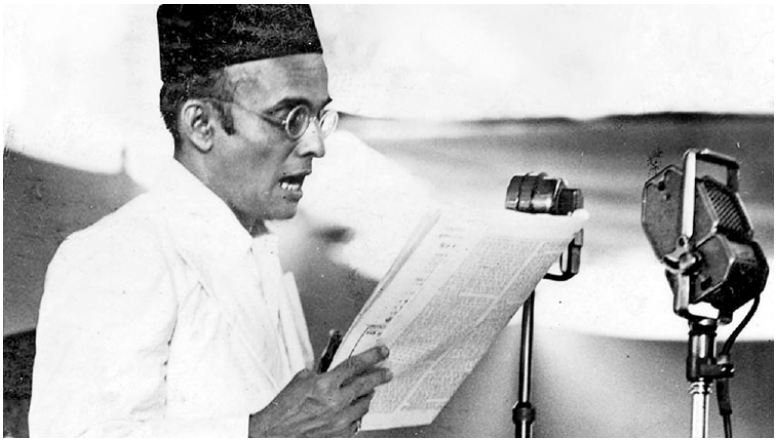
সাভারকর

শ্বেত ছত্র নির্ভীক রামচন্দ্রের, মঙ্গলময় রামচন্দ্রের রাজসিংহাসনের উপর উন্মোচিত হলো, এবং শুধু আর্য রক্তের রাজন্যরা নয়, দক্ষিণের হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণও তাঁর প্রতি এক প্রেমপূর্ণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন - ঐ দিনটি আমাদের হিন্দু জাতির জন্ম দিবস। সেই দিনটি বাস্তবিকভাবে আমাদের জাতীয় দিবস ছিল: কারণ, আর্য ও অনার্যরা নিজেদের সম্মিলিত করে একটি জাতি হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। এই ঘটনা এর পূর্ববর্তী সব প্রজন্মের প্রয়াসকে একত্রিত করে রাজনৈতিক শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দেয় এবং এক নবীন ও অভিন্ন লক্ষ্য, এক অভিন্ন ধ্বজ ও এক অভিন্ন উদ্দেশ্য হস্তান্তরিত করে, যার জন্য পরবর্তীকালের সব প্রজন্ম সচেতন বা অসচেতনভাবে লড়াই করেছে ও রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে।"[২২] আজ, ২০২৪ সালে 'রাম থেকে রাষ্ট্র' কথাটি যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনা থেকে বলা হচ্ছে, সেই ভাবনার সূত্রপাত সাভারকরের লেখায়। পুরাকথাকে ইতিহাসের মতো করে উল্লেখ করে, সেই কল্পিত ইতিহাসের ভিত্তিতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনা নির্মাণের এই রকম পরিকল্পিত প্রয়াস সাভারকরের গ্রন্থের আরও কয়েকটি স্থানে দেখা যায়।

যুক্তপ্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ)

ব্রিটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের (অর্থাৎ বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড রাজ্য) হরিদ্বারে ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে কুম্ভ মেলাতে কাশিমবাজারের রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'সর্বদেশক হিন্দু সভা' গঠিত হয়। এই সংগঠনটি ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা' নাম গ্রহণ করে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মদন মোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬) ২০২২ সালে এই সংগঠনের সভাপতি হন। মদন

মদন মোহন মালব্য

মোহন মালব্যের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ভাবনা বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই দেখা যায়। তিনি ১৯১১ সালে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রস্তাবিত কর্মপন্থা নিয়ে রচিত একটি নিবন্ধে লিখেছেন, "প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব ধর্মকে সযত্নে আগলে রাখে। হিন্দুরাও নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এর বিপরীতে, সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোনও জাতি তাদের ধর্মের সঙ্গে হিন্দুদের চেয়ে গভীরভাবে যুক্ত নয়। আজ যদি তাদের (হিন্দুদের) জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে তারা যে বহুসংখ্যক কৃপা ভোগ করছে তার মধ্যে কোনটির জন্য তারা অন্যগুলির চাইতে বেশি কৃতজ্ঞ, তারা সম্ভবত দ্বিধাহীনভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার নাম করবে।"[২৩] যুক্তপ্রদেশে উনিশ শো ত্রিশের দশকের গোড়ায় ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রসারে মদনমোহন মালব্য কর্তৃক ১৯০৭ সালে স্থাপিত সাপ্তাহিক পত্রিকা অভ্যুদয় ও দুটি হিন্দি সংবাদপত্র আজ ও সৈনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[২৪]

টীকা

১. Baijayanti Roy, "Friedrich Max Müller and the Emergence of Identity Politics in India and Germany" in 'Publications of the English Goethe Society, Volume 85, Issue 2-3'; London: English Goethe Society, 2016, pp. 217-228.

২. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'; হুগলি: বুধোদয় যন্ত্র, ১৮৯৫, পৃ. ৬।

৩. তদেব, পৃ. ১৮।

৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ইতিহাসের উত্তরাধিকার", 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার'; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ১৩১-১৭০।

৫. কেদারনাথ দত্ত, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস, হিন্দু ও মোসলমানদিগের রাজত্ব এবং ইংরাজদিগের রাজ্যারম্ভের বিষয়'; কলিকাতা: সুচারু যন্ত্র, ১৮৬০, পৃ. ৮৪।

৬. হীরালাল চক্রবর্ত্তি, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস (হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ শাসন সম্বলিত লর্ড লিটনের পদত্যাগ পর্য্যন্ত)'; কলিকাতা: হীরালাল চক্রবর্ত্তি, ১৮৮২, পৃ. ২।

৭. তদেব, পৃ. ৮।

৮. তদেব, পৃ. ৭।

৯. চন্দ্রনাথ বসু, 'হিন্দুত্ব (হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস)'; কলিকাতা: মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৮৯২, 'ভূমিকা',

পৃ. ১।

১০. তদেব, 'ভূমিকা', পৃ. ১-২।

১১. তদেব, 'ভূমিকা', পৃ. ২।

১২. তদেব।

১৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, অষ্টম সম্ভার'; কলিকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৬১, পৃ. ৩৯৯।

১৪. তদেব, পৃ. ৪০১।

১৫. দয়ানন্দ সরস্বতী, 'সত্যার্থ-প্রকাশঃ (বঙ্গানুবাদ)'; কলিকাতা: মন্ত্রী, বঙ্গ-আসাম আর্য্য-প্রতিনিধি সভা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৪৬, পৃ. ২৪০-২৪৩।

১৬. তদেব, পৃ. ৪৪২-৪৪৭।

১৭. তদেব, পৃ. ৬১২।

১৮. G.V. Ketkar, "The All India Hindu Maha Sabha: Its Aims and Present Policy" in Nripendra Nath Mitra edited, 'The Indian Annual Register, January-June 1941, Vol. I'; Calcutta: The Annual Register Office, 1941, p. 277.

১৯. Shraddhananda Sanyasi, 'Hindu Sangathan: Savior of the dying race'; Delhi: Arjun Press, 1926, pp. 140-141.

২০. জ্ঞানোদয় পত্রিকার ১৮৫২ সালের ১ জুলাই সংখ্যায় 'হিন্দুধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশের মারাঠি থেকে বাংলা অনুবাদ লেখকের; দেখুন: 'The Dnyanodaya, Volume XI'; Bombay: American Mission Press, 1852, p. 200।

২১. Bal Gangadhar Tilak, 'Bal Gangadhar Tilak: His Writings and Speeches'; Madras: Ganesh & Co., third edition, 1922, pp. 36-37.

২২. Vinayak Damodar Savarkar, 'Hindutva: Who is a Hindu?'; Bombay: Veer Savarkar Prakashan, fifth edition, 1966, pp. 11-12.

২৩. Madan Mohan Malaviya, ‘Speeches and Writings of Madan Mohan Malaviya’; Madras: G.A. Natesan & Co., first edition, 1919, p. 257.

২৪. William Gould, ‘Language of Politics in Late Colonial India’, New York: Cambridge University Press, 2004, p. 109.

BRAV

PRITHVIRAJ CHAUHAN

hand was furious! His daughter Samyogita had eloped with viraj Chauhan, the warrior king of Delhi. She, like many others, smitten by tales of his daring, his nobility and his sense of our. Though the young couple's happiness was doomed, even in dying hour, it was the brave Prithviraj who chose how his life ld end.

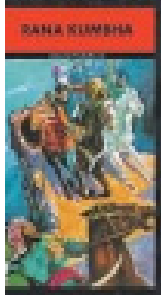

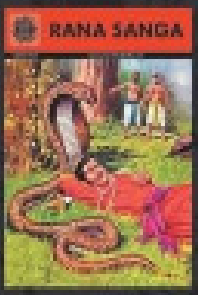

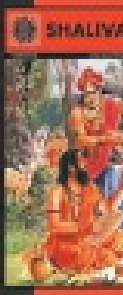

HER ACK **BRAVEHEARTS**:

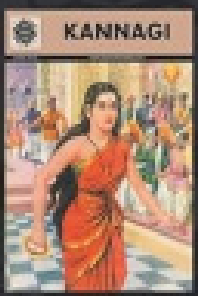

SO LOOK FOR:

S & MYTHOLOGY

INDIAN CLASSICS

FABLES & HUMOUR

VISIONA

Buy online at www.amarchitrakatha.com

বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কট্টরবাদী রূপ হিন্দুত্ববাদ ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই কালপর্বে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির শাসক, বৃহৎ ভূস্বামী, কিছু শিল্পপতি ও বহু ধনবান ব্যবসায়ী পরিবারদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এই মতবাদের প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করে।[১] ভারতের স্বাধীনতার পর বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বেশ কিছু বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো দুটি বৃহৎ হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ও তাদের বহু সংখ্যক গণ-সংগঠনগুলির সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ছোটো-বড়ো সংগঠনও হিন্দুত্ববাদী ধারণা প্রসারের কাজ শুরু করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালে অখিল ভারতীয় রামরাজ্য পরিষদ ও ভারতীয় জনসংঘ নামের দু'টি রাজনৈতিক দল জন্মগ্রহণ করে। ক্রমশ ভারতে হিন্দুত্ববাদ প্রভাবিত ইতিহাস চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

গীতা প্রেস ও কল্যাণ পত্রিকা

জয়দয়াল গোয়ন্দকা (১৮৮৫-১৯৬৫) ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের বাঁকুবড়=ড়ার এক মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী। তিনি কাপড়, কেরোসিন তেল ও বাসনপত্রের ব্যবসা করতেন। ১৯২২ সালে তিনি কলকাতার বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজের অফিস স্থাপন করেন, বাড়ির নাম দেন 'গোবিন্দ ভবন'। ১৯২৩ সালে তিনি এই বাড়ির ঠিকানায় ১৮৬০ সালের সোসাইটি পঞ্জিকরণ আইন অনুযায়ী 'গোবিন্দ ভবন কার্যালয়' সংস্থার পঞ্জিকরণ করেন। এই বছরই তাঁর

গোরখপুরের ব্যবসায়ী বন্ধু ঘনশ্যামদাস জালান এই সংস্থার অংশ হিসাবে গোরখপুর শহরে ভগবদগীতার প্রকাশ ও বিতরণের জন্য গীতা প্রেস স্থাপন করেন। ১৯২৬ সালে জয়দয়াল গোয়ন্দকার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার (১৮৯২-১৯৭১) ঐ

একই সংস্থার হয়ে গোরখপুর থেকে তাঁর সম্পাদিত হিন্দি 'কল্যাণ' মাসিক পত্রিকার প্রকাশের কাজ শুরু করেন।[২] ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে 'কল্যাণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বোম্বাইয়ের বেঙ্কটেশ্বর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে গোরখপুর থেকে কল্যাণ পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। ১৯২৭ সালে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ছিল কল্যাণ পত্রিকার প্রথম বিশেষ সংখ্যা — 'ভগবন্নামাঙ্ক'। ১৯৩৪ সালে এই সংস্থার ইংরেজি 'কল্যাণ-কল্পতরু' পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে 'মহাভারত' নামে আর একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়; তিন বছর বাদে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

গোড়া থেকেই গীতা প্রেসের ঘোষিত লক্ষ্য ধর্মীয় প্রচার। গীতা প্রেসের কল্যাণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার শুরুতেই দেখা গিয়েছে বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের রঙিন ছবি। কল্যাণ পত্রিকার জন্য নির্ধারিত ৯টি নিয়মের মধ্যে প্রথমটি এই পত্রিকার ঘোষিত উদ্দেশ্য - ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সদাচার সমন্বিত লেখা প্রকাশের মাধ্যমে জনতাকে কল্যাণের পথে পৌঁছে দেওয়া। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় পুস্তকের সস্তা অথচ উচ্চ মানের সংস্করণ প্রকাশ প্রথম থেকেই এই সংস্থার বিশেষত্ব। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত গীতা প্রেসের ভগবদগীতা বাদ দিলে সবচেয়ে জনপ্রিয় বই গোস্বামী তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। 'দৈনিক জাগরণ' সংবাদপত্রে ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি সংবাদ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামের প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে যে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিণামে সম্প্রতি গীতা প্রেসের রামচরিতমানস বইয়ের বিক্রি এত বেড়ে গিয়েছে, যে তাঁরা সামলাতে না পেরে আন্তর্জালের মাধ্যমে তাঁদের ১০টি ভাষায় প্রকাশিত রামচরিতমানস বইয়ের সফ্ট কপি বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। পাশাপাশি, গুজরাত সরকার ছাত্রছাত্রীদের বিতরণের জন্য এই সংস্থার কাছ থেকে ভগবদগীতার ৫০ লাখ কপি কিনতে চেয়েছে।[৩] গীতা প্রেস শুধুই ভগবদগীতা ও রামচরিতমানস বইয়ের প্রকাশ নয়, গীতা ও রামায়ণ সভার মাধ্যমে নিয়মিত এই গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা করেছেন। গীতা প্রেসের নিজস্ব কথাবাচক কৃপাশংকর রামায়ণী ও অন্যান্য কথাবাচকরা রামচরিতমানস পাঠ শোনাকে উত্তর ভারতে বিংশ শতকের এক জনপ্রিয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবর্তিত করেন।[৪]

গীতা প্রেসের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী হিন্দি কল্যাণ পত্রিকার বর্তমান গ্রাহকসংখ্যা ২,৫০,০০০। ২০২৩ সালে এই মাসিক পত্রিকার ৯৭তম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার আগে ও পরে হিন্দি ভাষাভাষীদের মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, বিশেষ করে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচারে এই পত্রিকা অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালপর্বে হিন্দু কোড বিলের বিরোধিতা ও তারপর উনিশ শো' ষাটের দশকে গোহত্যা বন্ধের আইনের দাবিতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির আন্দোলনের বক্তব্য প্রচারে কল্যাণ পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯৫০ সালে কল্যাণ পত্রিকার ২৪তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা ছিল বিশেষ সংখ্যা — 'হিন্দু সংস্কৃতি অঙ্ক'। চিত্র সমেত ১০৪৬ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট এই সংখ্যায় হিন্দুত্ববাদের সমর্থনে লেখা রচনায় পরিপূর্ণ। প্রথমে শিবনাথ দুবের লেখা 'পরমাদরণীয় ডা. হেড়গেওয়ার' নিবন্ধটি দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। ইনি লিখছেন, কেশব বলিরাম হেড়গেওয়ার ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত অনেক সংগঠনে কাজ করার সময় আসেতু হিমাচল সমস্ত হিন্দুদের সংগঠিত করাই ভারত উদ্ধারের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুগম পথ বুঝতে পেরে ১৯২৫ সালের বিজয়াদশমীর দিন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্থাপনা করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই সংঘ ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। লক্ষণীয় এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর কংগ্রেস বা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কোনও উল্লেখ মাত্র নেই, মিথ্যার সাহায্য নিয়ে মিথ নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে কেবল হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির ত্রাণের জন্য তাঁর জীবনের প্রত্যেক ক্ষণ উৎসর্গিত ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৫] এই সংখ্যায় অখিল ভারতীয় রামরাজ্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী করপাত্রীর লেখা নিবন্ধটির শিরোনাম 'সংস্কৃতি-বিমর্শ'। এই নিবন্ধে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সংজ্ঞায়ন প্রসঙ্গে লিখছেন, "বেদ এবং বেদানুসারী আর্য ধর্মগ্রন্থসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ লৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় (আচার-অনুষ্ঠান) এবং নিঃশ্রেয়সোপযোগী (মোক্ষলাভের উপযোগী) বিষয়গুলিই মুখ্য সংস্কৃতি এবং সেটাই হিন্দু সংস্কৃতি, বৈদিক সংস্কৃতি অথবা

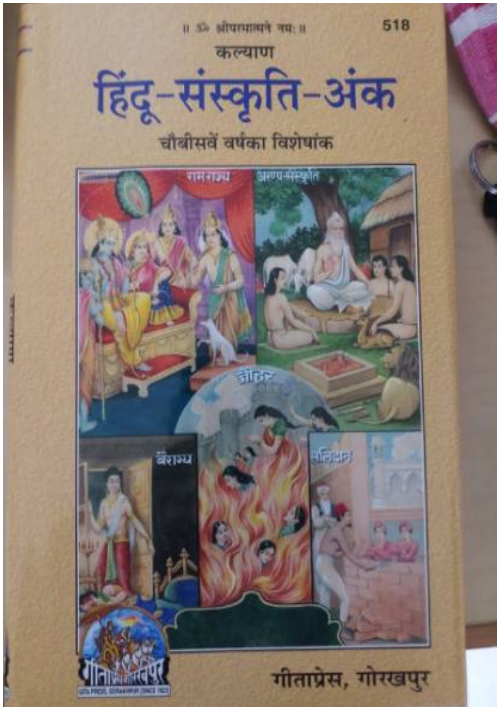

কল্যাণ পত্রিকা

ভারতীয় সংস্কৃতি।" তাঁর মতে, যে রকম মুসলিম জাতির ভিত্তি 'কুরান', সেই রকমই বৈদিক সনাতন সংস্কৃতি ও হিন্দু জাতির ভিত্তি অনাদি, অপৌরুষেয় বেদ গ্রন্থ। তিনি লিখছেন, "ভারত হিন্দুদের দেশ, তাই তাঁদেরই 'সংস্কৃতি' 'ভারতীয় সংস্কৃতি', যার মূল উৎস বেদাদি শাস্ত্র।" এরপর, তিনি নাম উল্লেখ না করে সাভারকরের 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞায়নের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই সংজ্ঞায় যারা বেদ মানে না, তাদেরও হিন্দু বলে স্বীকার করা হয়েছে। স্বামী করপাত্রী তাঁর মনোমত সংজ্ঞা একটি সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী হিন্দু হওয়ার তিনটি শর্ত - গোমাতার প্রতি ভক্তি, প্রণব (ওংকার) মন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস। তিনি ভারতের সর্বধর্ম সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারণাকে 'খিচুড়ি সংস্কৃতি' অভিধায় অভিহিত করে লিখেছেন, এই সংস্কৃতির ধারণাকে কখনওই ভারতীয় সংস্কৃতি বলা যেতে পারে না।[৬] কল্যাণ পত্রিকার এই সংখ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের লেখা 'হিন্দু সংস্কৃতি'। এখানে গোলওয়ালকর 'হিন্দু সংস্কৃতি' অনুসারী যে কাল্পনিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন, আজ, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদপ্রাপ্ত হিন্দুত্ববাদীদের কেউই হয়তো তাঁর সেই ধারণাকে কার্যকর করতে রাজি হবে না। কিন্তু, সেদিন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালপর্বে, উচ্চবর্গের মধ্যে হিন্দুত্ববাদের ধারণাকে জনপ্রিয় করতে এই রকম একটি সমাজের কল্পনা প্রচার জরুরি ছিল। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এই কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি (এর পূর্বে কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিকে তিনি 'কৃত' যুগ বলে উল্লেখ করেছেন) অর্জিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের রূপ কেমন হবে? ততক্ষণ পর্যন্ত তো রাজকীয় শক্তি ছাড়া কাজ চলবে না। এই কথাই হিন্দু সংস্কৃতি স্বীকার করে নিয়েছে। রাজকীয় শক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার পর তারা (অর্থাৎ হিন্দুরা) এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা সমাজকে স্বাধীনতার সুখ দেওয়ার জায়গায় দাসত্ব ও দুঃখই দেবে। তাই তারা উপর থেকে নির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ পুরুষদের (অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের) দ্বারা ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ এনেছে। তাঁদের (অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের) রাজকীয় শক্তির দ্বারা হতে পারে এমন অন্যায়কে অন্যায়ই বলে সেই শক্তিকে পরিবর্তন করার অধিকারও দিয়েছে; কিন্তু, তারা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা) নিজেরা নিঃস্বার্থভাবে তাদের রাজকীয় ক্ষমতা উপভোগ থেকে সর্বথা দূরে রেখেছে। ধর্ম, ন্যায় প্রদানকারী এবং রাজকীয় ক্ষমতাকে পৃথক রেখে, যা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে অত্যাচারী ও বেদনাদায়ক হতে পারে, সেই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার সুব্যবস্থা (হিন্দুরা) করেছে।"[৭] বিগত সাত দশকে কীভাবে ক্রমাগত নতুন মিথ নির্মাণ করে হিন্দুত্ববাদী ধারণাকে জনপ্রিয় রাখা হয়েছে, সেটা গোলওয়ালকরের 'হিন্দু সংস্কৃতি' নিবন্ধ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। গোলওয়ালকরের এই নিবন্ধের মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবনা বর্তমান হিন্দুত্ববাদী চিন্তাবিদরা কেউ প্রকাশ্যে বলতে রাজি হবেন না। এই

সংখ্যায় সংকলিত আর একটি নিবন্ধের কথা উল্লেখ করা দরকার আছে। গোরখপুরের মহন্ত ও হিন্দু মহাসভার নেতা দিগ্বিজয়নাথের লেখা এই নিবন্ধটির শিরোনাম 'হিন্দুত্ব কি সাম্প্রদায়িকতা?' ('কয়া হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িকতা হৈ?')। এই নিবন্ধে দিগ্বিজয়নাথ সাভারকরের হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদী সংজ্ঞাকে সমর্থন করে লিখেছেন, "হিন্দু সত্যিকার অর্থে খাঁটি রাষ্ট্রিয় (অর্থাৎ জাতিবাদী) হবে। সে পিতৃ-ভূমি ও পুণ্য-ভূমি বলে গ্রহণ করার পর আর নিজের দেশের সঙ্গে কোনও রকমেরই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। একজন মুসলমান বা একজন ইংরেজ ভারত-ভূমিকে তার পিতৃ-ভূমি বলে স্বীকার করলেও, যতক্ষণ সে তাকে পুণ্য-ভূমি বলেও না গ্রহণ করবে, অর্থাৎ এখানকার তীর্থগুলিকে নিজেদের তীর্থ বলে গ্রহণ না করবে, এখানকার মহাপুরুষদের নিজেদের মহাপুরুষ বলে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ তাকে হিন্দু বলা যাবে না। তাকে ফিলিস্তিন ও মক্কার স্মৃতি ত্যাগ করতেই হবে আর খাঁটি ভারতীয় হতেই হবে। অতএব কেবল পিতৃ-ভূমি বলে গ্রহণ করে নিলেই কেউ জাতিবাদী হয়ে যাবে না, পুণ্য-ভূমি বলে গ্রহণ করাও তার জন্য প্রয়োজনীয়।"[৮] আজকের ভারতে যে ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ আবহ বিদ্যমান, এই নিবন্ধে সেই আবহ সৃষ্টির প্রয়াস ভরপুর।

ওক ও তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থাবলি

পুরুষোত্তম নাগেশ ওক (১৯১৭-২০০৭) ইন্দোরের এক মারাঠি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওক ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরে কাজ করতেন, পরে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার কাজও করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি 'ইন্সটিটিউট ফর রিরাইটিং হিস্ট্রি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ইনি ইংরেজি, হিন্দি এবং মারাঠিতে বেশ

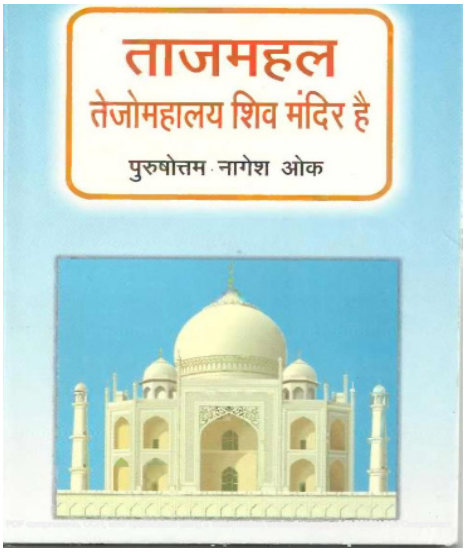

কয়েকটি বই লিখেছেন। এর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে পরিচিত রচনা বোধ হয় 'দ্য তাজ মহল ইজ তেজো মহালয়: আ শিব টেম্পল'। এর হিন্দি সংস্করণের শিরোনাম 'তাজমহল: তেজোমহালয় শিব মন্দির হৈ' ও মারাঠি সংস্করণের শিরোনাম 'তাজমহাল নব্হে তেজোমহালয় (শিবমন্দির)'। এরপর এই বইটি ''দ্য তাজ মহল ইজ আ টেম্পল প্যালেস' নামে প্রকাশিত হয়। এর হিন্দি সংস্করণ 'তাজমহল মন্দির ভবন

হৈ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে, 'লখনউস ইমামবাড়াস আর হিন্দু প্যালেসেস', 'আগ্রা রেড ফোর্ট ইজ আ হিন্দু বিল্ডিং', 'সাম ব্লান্ডারস অফ ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিসার্চ', 'আগ্রে কে লাল কিলা হিন্দু ভবন হৈ', 'দিল্লী কা লাল কিলা লাল কোট হৈ', 'ফতেহপুর সীকরী এক হিন্দু নগর', 'ভারতীয় ইতিহাস কী ভয়ংকর ভুলেঁ', 'কৌন কহতা হৈ অকবর মহান থা?', 'ভারত মেঁ মুসলিম সুলতান', 'বৈদিক বিশ্ব রাষ্ট্র কা ইতিহাস', 'বিশ্ব ইতিহাস কে বিলুপ্ত অধ্যায়' এবং 'ক্রিশ্চিয়নিটি কৃষ্ণ-নীতি হৈ'। দিল্লির হিন্দুত্ববাদী প্রকাশনা সংস্থা হিন্দী সাহিত্য সদন তাঁর বইগুলিকে আজও প্রকাশ করে চলেছে।

ওক তাঁর বইগুলিতে নিজের বক্তব্য প্রমাণ করতে বিভিন্ন ভাষার প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ নিয়ে একটি অদ্ভুত খেলা খেলেছেন। এই খেলাটি এখন হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধগুলির অন্যতম জনপ্রিয় যুক্তিতে (!) পরিণত হয়েছে। ওক বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর দুটি পৃথক ভাষার দুটি শব্দের মধ্যে সামান্যতম মিল থাকলেই তার অর্থের দিকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, একটি থেকে অন্যটি উদ্ভূত হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যেমন তাঁর মতে তাজ মহল শব্দটি তেজো মহালয়। থেকে উদ্ভূত তিনি খুব ভালো করে জানতেন তাঁর পাঠকরা শব্দের ব্যুত্পত্তির বৈজ্ঞানিক ধারণা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে তাঁর কল্পিত হিন্দু ভবন ইসলামী ভবনে পরিবর্তিত হওয়ার কাহিনির দিকে বেশি মনোযোগ দেবে, এবং বাস্তবেই তাই হয়েছে। তিনি শুধু শব্দ নয়, পুরাকথার ক্ষেত্রেও এই একই ধরনের খেলা খেলেছেন। কিছু সাদৃশ্যকে উল্লেখ করে তিনি প্রাক-ইসলামী আরব দেবদেবীদের ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীতে রূপান্তরিত করেছেন, তাঁর কল্পিত ইতিহাসে কাবা আসলে শিব মন্দির।[৯] ওক অবশ্য কল্পনার সাথে সাথে তাঁর কাহিনির বিশ্বসনীয়তা প্রমাণ করতে বহু ঐতিহাসিক তথ্যকে নিজের মতো করে এমনভাবে পেশ করেছেন, যা ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ পাঠককে তাঁর বক্তব্য মেনে নিতে প্রেরিত করে। যেমন, ওক তাঁর তাজ মহল নিয়ে লেখা বইয়ের প্রথমেই কোনও তথ্য বা যুক্তি ছাড়াই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছেন, এই সমাধি ভবনকে প্রথম থেকেই তাজমহল নামে উল্লেখ করা হতো (যদিও সমসাময়িক লেখক আবদুল হামিদ লাহোরি তাঁর পাদশানামা গ্রন্থে এই সমাধি ভবনকে 'রৌজা-ই-মুনাওয়ারা'(উজ্জ্বল সমাধিক্ষেত্র) নামে উল্লেখ করেছেন[১০])। তারপর তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক তথ্য পেশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কেন এই ভবনটির তাজমহল নামকরণ যথার্থ নয় বা ভবনটি আসলে সমাধি নয়, তেজো মহালয় নামের একটি শিব মন্দির।[১১] ওকের লেখা বইগুলির শেষে সংযুক্ত আকর গ্রন্থের তালিকা তাঁর রচনাগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা গ্রন্থের চেহারা দিতে সক্ষম হয়েছে। ওকের পরবর্তী কালের হিন্দুত্ববাদী কল্পিত ইতিহাসের লেখকরা

তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। আজ হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখকদের কাছে তিনি প্রেরণার উৎস।

পুরুষোত্তম নাগেশ ওক কল্পিত ইতিহাস সৃষ্টির যে ধারাটির জন্ম দিয়েছিলেন, তা ছাড়াও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি আরও বেশ কয়েকটি ধারার জন্ম দিয়েছে। সেই ধারাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখনীয় কল্পিত নায়কদের 'ইতিহাস' নির্মাণ। সেই ধারার দু'টি উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক।

সুহলদেব – কাহিনির চরিত্র থেকে ইতিহাসের নায়ক

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে আনুমানিক ১৬২০ সাল নাগাদ আওধের সুফি কবি আবদুর রহমান চিশতি 'মিরাত-ই-মাসুদী' (মাসুদের আয়না) নামে ফার্সি ভাষায় একটি রোমান্টিক কাব্য রচনা করেন। গজনীর সুলতান মাহমুদের (রাজত্বকাল ৯৯৮-১০৩০ সাধারণাব্দ) ভগ্নী সিতর-ই-মুয়াল্লা ও সালার সাহুর পুত্র বলে বর্ণিত সালার মাসুদ গাজীর (১০১৪-১০৩৪ সাধারণাব্দ) জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা এই কাহিনির এক চরিত্র রাজা সুহেলদেব। আবদুর রহমান চিশতি তাঁর গ্রন্থের উৎস হিসাবে গজনীর সুলতান মাহমুদের এক কর্মচারি মুল্লা মহম্মদ গজনবীর লেখা 'তারিখ-ই-মাহমুদী' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। কবি আবদুর রহমান চিশতির মতে যেহেতু মুল্লা মহম্মদ গজনবী সালার মাসুদ ও তাঁর পিতা সালার সাহুর ভারত অভিযানের সঙ্গী ছিলেন, তাই তাঁর রচনা ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা।[১২] মুল্লা মহম্মদ গজনবীর লেখা 'তারিখ-ই-মাহমুদী' গ্রন্থের অস্তিত্বের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সালার মাসুদ নামে সুলতান মাহমুদের কোনও ভাগ্নে ছিল বলেও অন্য কোনও গ্রন্থে উল্লেখ নেই।[১৩] 'মিরাত-ই-মাসুদী'র কাহিনি অনুযায়ী সালার মাসুদ তাঁর ভারত অভিযানের সময় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঘাঘরা নদী পার হয়ে বহরাইচ অঞ্চলে পৌঁছান। সেখানে, ১০৩৪ সালের ১৪ জুন চিতৌরায় স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধে বহু সৈন্যের মৃত্যু হয়। ক্ষিপ্ত মাসুদ সমস্ত মৃত সৈন্যদের দেহ সেখানকার পবিত্র সুরজ কুণ্ডে ফেলে দেন। মাসুদের সৈন্যবল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দেখে, সহর দেও (বা সোহল দেও) ও হর দেও বাকি স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে তাঁদের সেনা নিয়ে সালার মাসুদের সেনাবাহিনীর উপর চূড়ান্ত আক্রমণ করেন। যুদ্ধে সব সৈন্য সমেত সালার মাসুদ নিহত হন। বহরাইচের সেনাশিবিরে সালার মাসুদের মৃত্যুর খবর পৌঁছানোর পর তাঁর সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম এসে সোহল দেওকে হত্যা করে নিজেও নিহত হন। দুই পক্ষের সব সৈন্যেরই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয়।[১৪]

উনিশ শতক পর্যন্ত 'মিরাত-ই-মাসুদী' জনমানসে প্রায় বিস্মৃত ছিল। ১৮৬৯ সালে এই গ্রন্থের একটি ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার হেনরি এলিয়ট রচিত 'দ্য হিস্ট্রি অফ

ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ানস: দ্য মুহাম্মডান পিরিয়ড' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ সালে ইনায়ত হুসেন রচিত 'তারিখ সালার মাসুদ' এই গ্রন্থের একটি উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পর হিন্দিতে এই কাহিনির সোহল দেওকে নায়ক ও গাজী মিয়াঁ অর্থাৎ সালার মাসুদকে খলনায়ক বানিয়ে বেশ কিছু পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সব হিন্দি কাহিনিতে নায়কের নাম সুহলদেব, সকরদেব, সুহির্দধ্বজ, রায় সুহৃদদেব, সুহৃদিল, সুসজ, শহরদেব, সহরদেব, সুহালদেব, সুহিলদেব ও সুহেলদেব বলে উল্লিখিত হয়েছে। 'মিরাত-ই-মাসুদী' গ্রন্থে সুহলদেব ভর থারু জাতিভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫] কিন্তু, ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত 'গেজেটিয়ার অফ দ্য প্রভিন্স অফ আওধ' বইতে বলা হয়েছে, আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রদত্ত গোণ্ডার থারু রাজবংশের ঐতিহ্যগত বংশপঞ্জি অনুযায়ী, রাজা সুধন্যধ্বজের পুত্র সুহৃদলধ্বজ আনুমানিক ১০০০ সাধারণাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এই বইতে আরও বলা হয়েছে, এই শাসককে থারু, ভর, কলহংস, বৈস রাজপুত ও সরাবক (অর্থাৎ জৈন) বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬] পরবর্তী কালে তাঁকে পাণ্ডববংশী তোমর, ভারশিব, নাগবংশী ক্ষত্রিয়, সূর্যবংশী ক্ষত্রিয়, বিসেন ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হলেও আজ তিনি শ্রাবস্তীর শাসক মোরধ্বজের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলেও পরিচিত। ১৯৯৭ সালে হিন্দুত্ববাদী লেখক ত্রিলোকীনাথ কোল রচিত 'হিন্দু সমাজ কে গৌরব, পাসি বীর মহারাজা সুহলদেব কী শৌর্য গাথা' বইতে তাঁকে পাসি বীর হিসাবে নির্মাণের পর বর্তমানে সুহলদেব পাসি জাতিভুক্ত বলেই তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত।[১৭]

সুহলদেবকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী মিথ নির্মাণের সূত্রপাত ১৯৪০ সালে বহরাইচের এক বিদ্যালয় শিক্ষক গুরু সহায় দীক্ষিত দ্বিজদীন রচিত 'শ্রীসুহল বাওনি' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। ১৯৫০ সালে এই বইটির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারতের স্বাধীনতার পর আর্য সমাজ, রামরাজ্য পরিষদ ও হিন্দু মহাসভা সুহলদেবের স্মারক নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে চিতৌরায় সুহলদেবের স্মরণে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। পরবর্তী কালে স্থানীয় দুই শিল্পীভ্রাতা ললিত নাগ ও রাজকুমার নাগের অঙ্কিত সুহলদেবের একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়, চিতৌরায় সুহলদেবের তাঁর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয় ও পরে সেই প্রতিমাকে কেন্দ্র করে একটি মন্দির নির্মিত হয় এবং তারপর, মহারাজা সুহলদেব বিজয়োৎসব পালনও শুরু হয়। ২০০১ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ 'মহারাজা সুহলদেব সেবা সমিতি' নামের একটি সংগঠন তৈরি করে।[১৮] ২০০২ সালে ওম প্রকাশ রাজভরের নেতৃত্বে 'সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। একুশ শতকে লখনউ সমেত উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু স্থানে

সুহলদেবের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। ২০১৮ সালে ভারত সরকার মহারাজা সুহেলদেবের স্মরণে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। ২০২০ সালে অমিশ ত্রিপাঠির লেখা 'লেজেন্ড অফ সুহেলদেব: দ্য কিং হু সেভড ইন্ডিয়া' নামে একটি উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুত্ববাদ প্রভাবিত ইতিহাস নির্মাণের মাধ্যমে সুহলদেব আজ আদি-মধ্যযুগের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

সুহেলদেবের স্মরণে ডাকটিকিট

বিক্রমজিৎ - লোককথা থেকে ইতিহাসের বীর

বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' বইয়ের প্রথম খণ্ডে মঙ্গলকোট প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কোনো হিন্দু সামন্তরাজার গড়বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল মঙ্গলকোটে (বিক্রমকেশরীর?) এবং তারই পাশে নদীতীরে উজানিতে বাংলার হিন্দু সদাগররা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যনগর গড়ে তুলেছিলেন।...স্থানীয় কোনো হিন্দু সামন্তরাজার গড়দুর্গ ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু কে সেই রাজা, তাঁর নাম-গোত্র কি, ইতিহাস কি, তা জানবার কোনো উপায় নেই। কবিরা বিক্রমকেশরী রাজার কথা বলেছেন: বিক্রম কেশরী তাঁহার নগরী/ আছে কত সদাগর। কে এই বিক্রমকেশরী? রাজার কাব্যিক বিশেষণ, না রাজা নিজে? জানবার উপায় নেই। অর্বাচীন 'বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য' গ্রন্থে এই বিক্রমকেশরী ও তাঁর পূর্বের শ্বেতরাজার উল্লেখ আছে...শ্বেত নামে এক মহাদানশীল উদার রাজা ছিলেন। তিনি শৈবধর্মী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, মঙ্গলকোটে হয়তো গোপভূমের সদগোপ রাজাদের এক শাখার বংশধররা রাজত্ব করতেন (বর্ধমান গেজেটিয়ার)। আবার বিক্রমকেশরী নামেও কোনো সামন্তরাজা থাকতে পারেন, হয়তো গোপভূমের সদগোপ রাজবংশধরই কেউ। এখন কোনো প্রমাণ নেই তার। 'বিক্রমাদিত্যের ডাঙা' বা বিক্রমজিতের বাড়ির ঢিবি আছে একটি মঙ্গলকোটে এবং সেই ঢিবি কেন্দ্র করে এই কিংবদন্তী।"[১৯] তিনি আরও লিখেছেন, "মঙ্গলকোট আঠার আওলিয়ার স্থান বলে পরিচিত।...আঠারজন মুসলমান সাধুপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত মঙ্গলকোট বাংলার মুসলমানদের অন্যতম তীর্থস্থান বললেও বিশেষ ভুল হয় না। মঙ্গলকোট-নিবাসী মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল সাহেব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে ইতিহাস

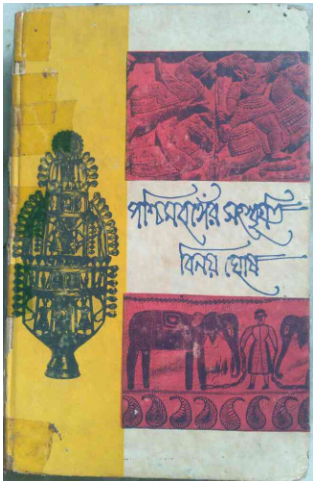

বলেছিলেন তা সংক্ষেপে এই: মঙ্গলকোটে নামে এক হিন্দুরাজা ছিলেন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। সেই সময় সতেরজন (না, আঠার?) ধর্মযোদ্ধা বা গাজীসাহেব কাফেরদের পরাজিত করে মঙ্গলকোট দখল করতে আসেন। ধর্মযুদ্ধে গাজীরা একে-একে নিহত হন, মঙ্গলকোটে তাঁদের সমাধি আছে। শেষে গজনবী নামে একজন গাজী বা পীর মঙ্গলকোট অধিকার করেন এবং হিন্দুরাজা নিহত হন।...মঙ্গলকোটের আঠারজন আওলিয়ার সকলের নাম জানা যায় না।"[২০]

বিনয় ঘোষ তাঁর লেখায় বারবার সংশয় প্রকাশ করেও দুটি পৃথক লোককথার শাসককে একক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন সূচিত করেছিলেন। তাঁর লেখায় বর্ণিত মিথের আরও পরিবর্তন করে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস অনুসন্ধানীরা তাঁদের আন্তর্জাল মাধ্যমে লেখা নিবন্ধগুলিতে বিক্রমজিৎকে সুলতানি শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী এক সদগোপ রাজায় পরিণত করেছেন। এমনই এক অতি-সাম্প্রতিক নিবন্ধে জনৈক 'সনাতনী ইতিহাস সন্ধানী ও প্রচারক' বিক্রমজিৎকে সাল-তারিখ সমেত অন্ত-মধ্যযুগের এক 'যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়' শাসক হিসাবে নির্মাণ করেছেন।[২১] হিন্দুত্ববাদ প্রভাবিত ইতিহাস নির্মাণের মাধ্যমে স্বল্প দিনের মধ্যেই বিক্রমজিৎও সুহলদেবের মতোই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন (অথবা হয়তো ইতিমধ্যে হয়েও গিয়েছেন)।

অমর চিত্র কথা — পুরাকথা যেখানে ইতিহাস

১৯৬৭ সালে অনন্ত পাই ভারতীয় চরিত্র তাঁর লেখা 'অমর চিত্র কথা' সিরিজের একাদশ সংখ্যক ইংরেজি কমিক স্ট্রিপ 'কৃষ্ণ' মুম্বই থেকে প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে অনন্ত পাই এই সিরিজের বইগুলি লেখার জন্য কয়েক জন লেখককে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতেন। 'অমর চিত্র কথা' সিরিজ জনপ্রিয় হওয়ার পর কমিক স্ট্রিপগুলির ইংরেজির সাথে সাথে হিন্দি, তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, তেলেগু, বাংলা, অসমীয়া, মারাঠি, পাঞ্জাবি ও গুজরাতি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে।[২২] 'অমর চিত্র কথা' সিরিজের অন্তর্গত কয়েকশো কমিক স্ট্রিপের মধ্যে সাম্প্রতিকতম সংযোজন প্রধানমন্ত্রীর মাসিক রেডিও ভাষণ 'মন কী বাত'-এর চিত্রায়িত রূপসমূহ। এই সিরিজের বইগুলির শেষ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত নারায়ণ মূর্তির একটি মন্তব্যে অমর চিত্র কথাগুলি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি মহিমামণ্ডিত

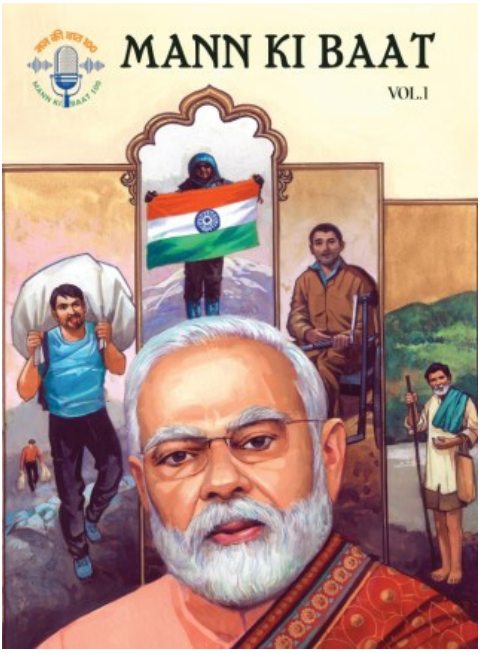

শ্রদ্ধাঞ্জলি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, 'অমর চিত্র কথা' সিরিজের পুরাকথার ও ইতিহাসের চরিত্রদের নিয়ে লেখা বেশ কিছু কমিক স্ট্রিপ পড়লে বোঝা যায়, এই বইগুলিতে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ধারণার প্রসারের যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। এই কমিক স্ট্রিপগুলিতে বেশ কিছু স্থানে পুরাকথা, কাল্পনিক কাহিনি অথবা অর্ধসত্যের সহায়তায় মিথ নির্মাণ এবং জাতিভেদ বা বিধবা দহনের মতো প্রথার প্রতি সমর্থনসূচক মন্তব্য দেখতে পাওয়া যায়।

'অমর চিত্র কথা' সিরিজের 'পৃথ্বীরাজ চৌহান' কমিক স্ট্রিপ ইতিহাসের সঙ্গে কল্পিত কাহিনিকে মিশিয়ে দেওয়ার বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে। এই বইতে যেমন তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে ঘোরির আরও ৭ বার ভারত আক্রমণ ও পৃথ্বীরাজের কাছে পরাস্ত হয়ে ফিরে যাওয়ার 'পৃথ্বীরাজপ্রবন্ধ' উল্লিখিত কল্পিত কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই এখানে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী ঐতিহাসিক

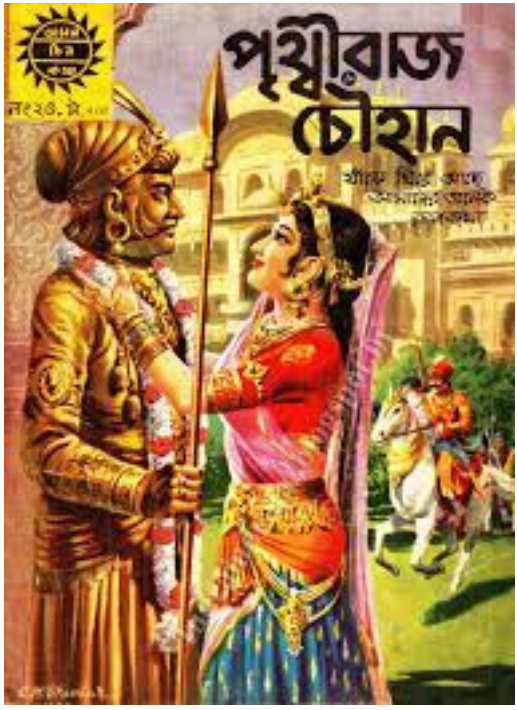

ঘটনার পরিবর্তে 'পৃথ্বীরাজ রাসো'র কল্পিত কাহিনি সংযোজন করা হয়েছে।[২৩] মিথ্যার সাহায্য নিয়ে মিথ নির্মাণের প্রয়াসের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'রণজিৎ সিংহ' কমিক স্ট্রিপে লেখা হয়েছে, মহারাজা রণজিৎ সিংহ যে নতুন মুদ্রা জারি করেন, তাতে শুধু গুরু নানকের নাম ও চিত্র উত্কীর্ণ, রণজিৎ সিংহের কোনও নাম বা চিত্র নেই।[২৪] অথচ, বাস্তবে ১৮৮৫ বিক্রমসংবতে (১৮২৮ সাধারণাব্দে) জারি করা রৌপ্যমুদ্রায় গুরু নানক ও রণজিৎ সিংহ, উভয়েরই চিত্র উত্কীর্ণ করা আছে। 'বীর সাভারকর' কমিক স্ট্রিপে অর্ধসত্য পরিবেশনের একাধিক প্রয়াস দেখা যায়। বিনায়ক সাভারকরের আত্মজীবনীর ভিত্তিতে রচিত এই বইয়ের এক স্থানে আচমকাই উল্লেখ হয়েছে, ননীগোপাল (মুখোপাধ্যায়) অনশন ধর্মঘট চালিয়ে মৃত্যুমুখে উপনীত হওয়ায় বিনায়ক সাভারকর তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য নিজেও অনশন ধর্মঘট শুরু করেন এবং ননীগোপালকে গিয়ে অনশন ত্যাগ করার জন্য বোঝান।[২৫] এই অংশটিতে অত্যন্ত সুচারুভাবে অর্ধসত্য পরিবেশন করা হয়েছে। বাস্তবে, ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় অনশন ধর্মঘট শুরু করার পর তাঁর সমর্থনে অন্যদের সঙ্গে তাঁর বড়ো ভাই বাবারাও সাভারকর অনশন ধর্মঘট শুরু করলেও, তিনি করেননি। বিনায়ক সাভারকর তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি অনশন ধর্মঘটের বিরোধী ছিলেন এবং ননীগোপালকে অনশন ধর্মঘট থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কথায় অন্যরা অনশন ত্যাগ করলেও ননীগোপাল ত্যাগ করেননি। তাই, শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর মাসের শেষে ননীগোপাল মৃত্যুমুখে উপনীত হলে, তাঁর অনশন ধর্মঘট সমাপ্ত করতে বিনায়ক সাভারকর ৩ দিনের অনশন ধর্মঘট করার কথা ঘোষণা করেন। পরের দিন তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করলেও, তাঁর কথায় ননীগোপাল অনশন ধর্মঘট সমাপ্ত করায় তিনিও সেই দিনই অনশন ত্যাগ করেন।[২৬] এই কমিক স্ট্রিপের শেষে এই রকমই আর একটি অর্ধসত্য লেখা হয়েছে, "সরকার সাভারকরকে 'ভারতের শান্তির জন্য বিপদ' বলে মনে করত। তাঁকে অন্তরীণ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৩৭ সালে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়। সাভারকর স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ত্রিবর্ণ পতাকার উত্তোলন প্রত্যক্ষ করার তৃপ্তি লাভ করেছিলেন।"[২৭] আশ্চর্যজনকভাবে, এখানে কোথাও সাভারকরের ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার চিঠিগুলির উল্লেখ মাত্র নেই, আর ১৯৩৭ সালের অনেক আগে, ১৯২৪ সালের ৬ জানুয়ারি যে তাঁর কারামুক্তি হয়েছিল তারও কোনও উল্লেখ নেই।

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা

১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক মোরোপন্ত নীলকণ্ঠ পিংগলে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮]

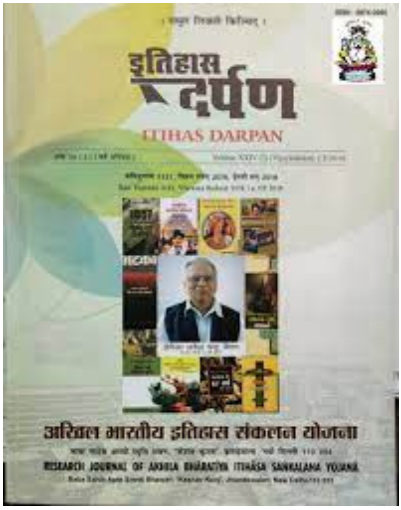

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা সংগঠনের পত্রিকা 'ইতিহাস দর্পণ' ১৯৯৪ সালের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। দিল্লি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রথম প্রচারকদের অন্যতম উমাকান্ত কেশব (বাবা সাহেব) আপটে (১৯০৩-১৯৭২) এই সংগঠনের প্রেরণা স্রোত বলে উল্লিখিত।[২৯] ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের হিমাচল প্রদেশের প্রচারক ঠাকুর রাম সিংহ (১৯১৫-২০১০) এই সংগঠনের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা সংগঠনের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ (জাতীয় সভাপতি) নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ সাল থেকে হিমাচল প্রদেশের কুলুতে এই সংগঠন তাদের প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকার মাধ্যমে মৌখিক পুরাকথাকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে সেখানকার লৌকিক দেবদেবীদের পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রূপ বলে প্রমাণ করার কাজ শুরু করে।[৩০] ২০১৪ সালের জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের সরকার ক্ষমতায় আসার পর জুলাই মাসে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা সংগঠনের অন্ধ্রপ্রদেশ শাখার প্রধান যল্লাপ্রগড় সুদর্শন রাওকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টরিক্যাল রিসার্চ-এর সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়।

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার একটি পুস্তিকায় তাদের জাতীয় স্তরে তিনটি প্রকল্পের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম প্রকল্প, খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাশ্চাত্য বর্ষপঞ্জির পরিবর্তে একটি বৈজ্ঞানিক ভারতীয় কাল গণনার পদ্ধতির প্রচলন; দ্বিতীয় প্রকল্প, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (যেমন, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার উপগ্রহের চিত্র) ব্যবহার করে বৈদিক সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব প্রমাণ এবং তৃতীয় প্রকল্প, কলিযুগের প্রারম্ভের ৩৬ বছর পূর্বে মহাভারত যুদ্ধকে হিন্দু ইতিহাসের মূল বিন্দু প্রমাণ।[৩১] প্রথম প্রকল্পের বাস্তবায়নের নিদর্শন দেখা যায় অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা সংগঠনের 'ইতিহাস দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই যুগাব্দ (অর্থাৎ কলিযুগাব্দ) লেখায়। ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে পরিচিত দুটি প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ষপঞ্জি শকাব্দ বা শালিবাহন অব্দ এবং কৃত, মালব বা বিক্রম সংবত। এর মধ্যে শকাব্দকে ভারত সরকার ১৯৫৭ সালের ২২ মার্চ জাতীয় বর্ষপঞ্জি বলে স্বীকৃতি

দিয়েছে। এই বর্ষপঞ্জি বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে গঠিত পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি দ্বারা সংস্কৃত। কলিযুগাব্দ একটি ছদ্ম-ঐতিহাসিক বর্ষপঞ্জি। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ৩১০২ সাধারণপূর্বাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সূর্য, চন্দ্র ও তাঁদের জ্ঞাত সব গ্রহ মেষ নক্ষত্রে অবস্থান করেছে, এই অনুমান স্বীকার করে নিলে তাঁদের গণনাপদ্ধতি অনুযায়ী জ্যোতিষিক গণনা শুদ্ধ হয়, সেই কারণে তাঁরা এই দিনটিকে বর্তমান যুগের শুরু বা কলিযুগের শুরু বলে ধরে নেন। সপ্তম শতক সাধারণাব্দ থেকে ভারতের লেখগুলিতে কলিযুগাব্দ ব্যবহার শুরু হলেও সেই লেখগুলিতে একই সঙ্গে শকাব্দ বা বিক্রম সংবতও উল্লিখিত হয়েছে।[৩২] 'ইতিহাস দর্পণ' পত্রিকাতেও কলিযুগাব্দের সাথে বিক্রম সংবত উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু, ভারত সরকার স্বীকৃত বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক কাল গণনার পদ্ধতিকে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একটি ছদ্ম-ঐতিহাসিক বর্ষপঞ্জি গ্রহণ করেছে।

'ইতিহাস দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার শুরুতেই রয়েছে, মোরোপন্ত নীলকণ্ঠ পিংগলে রচিত নিবন্ধ 'নয়ে সিরে সে ইতিহাস সংকলন কী আবশ্যকতা'। এই নিবন্ধে তাঁর সংগঠনের কলিযুগাব্দকে গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি লিখেছেন, "ভারতের ইতিহাস রচনায় স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরেও — নিজেদের কালমানক (কাল গণনা পদ্ধতি) স্বীকৃত হয়নি। আমরা আজও খ্রি. বা খ্রি. পূর্ব ব্যবহার করি। কোনও ব্যক্তির নামে প্রচলিত কাল গণনা পদ্ধতি কখনও বৈজ্ঞানিক হতে পারে না। সেই জন্য আমাদের সর্বত্র প্রচলিত যুগাব্দ গণনা পদ্ধতির ব্যবহার ইতিহাস রচনাতেও স্বীকৃত হওয়া উচিত।"[৩৩] সম্ভবত নিবন্ধটির বক্তব্যের যুক্তিহীনতায় কিছুটা ভারসাম্য আনার জন্য এরপর এই সংখ্যায় ঠাকুর প্রসাদ বর্মা রচিত 'ভারতীয় কালগণনা এবং ইতিহাস সংকলন' ('ভারতীয় কালগণনা ওয়া ইতিহাস সংকলন') শিরোনামের একটি নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই নিবন্ধে তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণের সময় কলিযুগাব্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন, এই কালগণনা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত এবং এর ঐতিহাসিক সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার কোনও উপায় নেই। পাশাপাশি তিনি শকাব্দ ও বিক্রম সংবত নিয়ে বর্তমানে ইতিহাসবিদদের স্বীকৃত ধারণার বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন। এরপর তিনি চেষ্টা করেছেন পুরাকথাকে 'পৌরাণিক ইতিহাস' বা ঐতিহ্যগত ইতিহাস বলে প্রমাণের।[৩৪] ঠাকুর প্রসাদ বর্মা এই নিবন্ধে ইতিহাসের স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে ছদ্ম-ঐতিহাসিক বর্ষপঞ্জির প্রতি আস্থা নির্মাণের প্রয়াস করেছেন বলেই মনে হয়। অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার দ্বিতীয় প্রকল্প বৈদিক সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব প্রমাণের বিষয়ে 'ইতিহাস দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বরাজ প্রকাশ গুপ্তের লেখা 'দ্য ইন্ডাস-সরস্বতী সিভিলাইজেশন — অ্যান ওভারভিউ'

শিরোনামের একটি নিবন্ধ রয়েছে আর ভারতে মানব পরিযানের তত্ত্বের বিরোধিতা করে ঠাকুর রাম সিংহের লেখা 'আর্যো কা অভিজন: মধ্য এশিয়া সিদ্ধান্ত কা ষড়যন্ত্র ঔর উসকে দুষ্পরিণাম' শিরোনামের একটি নিবন্ধও এই সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদ ও লজ্জারাম তোমর

ভারতের স্বাধীনতার আগে থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদের ধারণা প্রসারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্যতম প্রচারক নানাজি দেশমুখ সংঘের শিক্ষা ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর শহরে প্রথম সরস্বতী শিশু মন্দির বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে উত্তর প্রদেশের বেশ কিছু স্থানে সরস্বতী শিশু মন্দির খোলা হয়। তারপর, দিল্লি, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশেও সরস্বতী শিশু মন্দির খোলা হয়। ১৯৫৮ সালে রাজ্য স্তরে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি 'শিশু শিক্ষা প্রবন্ধক সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনার জন্য 'বিদ্যা ভারতী' (বা বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান) গঠিত হয়; এই সংগঠনের সদর দপ্তর দিল্লিতে স্থাপিত হয়।[৩৫] ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তৃতীয় সরসংঘচালক মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাউরাও দেওরসের চিন্তনকে রূপ দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এক বরিষ্ঠ প্রচারক শ্যাম গুপ্ত ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় প্রথম একল বিদ্যালয় সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৮৯ সাল থেকে বাংলার গ্রামীণ এলাকাতে বহুসংখ্যক একল বিদ্যালয় শিশুদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদের প্রসারে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।[৩৬] ভারতের শিশু ও কিশোরদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী ধারণা প্রসারে বিদ্যা ভারতী, সরস্বতী শিশু মন্দির বা একল বিদ্যালয়গুলি ছাড়া আরও বেশ কিছু সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

লজ্জারাম তোমর (১৯৩০-২০০৪) ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিদ্যা ভারতীর সংগঠন মন্ত্রী (সাংগঠনিক সম্পাদক) থাকার পর বাকি জীবন বিদ্যা ভারতীর রাষ্ট্রীয় মার্গদর্শক পদে আসীন ছিলেন। লজ্জারাম তোমর হিন্দিতে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন - 'ভারতীয় শিক্ষা কে মূল তত্ত্ব' (১৯৮৪), 'বিদ্যা ভারতী চিন্তন কী দিশা' (২০০১) এবং 'প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি'। তিনি 'ভারতীয় শিক্ষা কে

মূল তত্ত্ব' বইতে হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য যে জাতীয়তাবাদের যে সংজ্ঞায়ন করেছেন, তা লক্ষণীয়: "পশ্চিমী দেশগুলিতে রাষ্ট্রকে (বাংলা জাতি) রাজনৈতিক একক বলে বিবেচনা করা হয়, সুতরাং তারা রাষ্ট্র (জাতি) ও রাজ্যের (বাংলা রাষ্ট্র) মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। জাতি স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ নিজেই জন্মগ্রহণ করে। ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী রাষ্ট্র (জাতি) একটি সাংস্কৃতিক একক। সামাজিক চুক্তির ধারণা রাষ্ট্রের (জাতির) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, রাজ্যের (রাষ্ট্রের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। সেই কারণেই ভারতে যারই রাজ্য থাকুক বা যে রকমই রাজ্যের (রাষ্ট্রের) কাঠামো হোক, তার দ্বারা রাষ্ট্রীয় (জাতীয়) একাত্মময় জীবন বিশেষ প্রভাবিত হয় না। ভারতে ভাষা, বেশভুষা, খাদ্যাভ্যাস, উপাসনার পদ্ধতির প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জীবনের আদর্শ, প্রেরণা ও লক্ষ্য এক হওয়ার জন্য রাষ্ট্র-জীবন (জাতীয় জীবন) এক।"৩৭ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাকে শৈশব থেকে মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য বিগত সাত দশক ধরে সংগঠিত প্রয়াস চলছে, লজ্জারাম তোমর সেই ধারণাকেই তাঁর সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

টীকা

১. Prabhu Bapu, 'Hindu Mahasabha in Colonial North India, 1915–1930: Constructing nation and history'; London and New York: Routledge, 2013, pp. 27-33.

২. Akshaya Mukul, 'Gita Press and the Making of Hindu India'; Noida, Uttar Pradesh: HarperCollins Publishers India, 2015, pp. 1-3.

৩. গজাধর দ্বিবেদী, "গীতা প্রেস কী धार्मिक पुस्तकों की बढ़ी मांग, प्राण प्रतिष्ठा के चलते रामचरित मानस का हुआ स्टॉक समाप्त; टूटा वर्षों का रिकॉर्ड", 'দৈনিক জাগরণ'; গোরখপুর শহর সংস্করণ, ১০ জানুয়ারি ২০২৪ [https://www.jagran.com/uttar-pradesh/gorakhpur-city-ramcharitmanas-increased-demand-for-religious-books-of-geeta-press-stock-of-ramcharitmanas-exhausted-due-to-pran-pratishtha-years-records-broken-23625460.html]।

৪. Akshaya Mukul, 'Gita Press and the Making of Hindu India', pp. 19-20.

৫. শিবনাথ দুবে, "পরমাদরণীয় ডা. হেড়গেওয়ার", হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, চিম্মনলাল গোস্বামী ও এম. এ. শাস্ত্রী সম্পাদিত 'কল্যাণ, হিন্দূ-সংস্কৃতি অঙ্ক, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১'; গোরখপুর: গীতা প্রেস, পৃ. ৯০২।

৬. স্বামী করপাত্রী, "সংস্কৃতি-বিমর্শ", হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, চিম্মনলাল গোস্বামী ও এম. এ. শাস্ত্রী সম্পাদিত 'কল্যাণ, হিন্দূ-সংস্কৃতি অঙ্ক, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১'; গোরখপুর: গীতা প্রেস, পৃ. ৩৫-৩৮।

৭. মাধবরাও সদাশিব গোলওয়ালকর, "হিন্দূ-সংস্কৃতি", হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, চিম্মনলাল গোস্বামী ও এম. এ. শাস্ত্রী সম্পাদিত 'কল্যাণ, হিন্দূ-সংস্কৃতি অঙ্ক, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১'; গোরখপুর: গীতা প্রেস, পৃ. ৫৭-৬০।

৮. মহন্ত দিগ্বিজয়নাথ, "কয়া হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িকতা হৈ?", হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, চিম্মনলাল গোস্বামী ও এম. এ. শাস্ত্রী সম্পাদিত 'কল্যাণ, হিন্দূ-সংস্কৃতি অঙ্ক, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১'; গোরখপুর: গীতা প্রেস, পৃ. ৬১-৬২।

৯. Kathinka Frøystad, "Affective digital images: Shiva in the Kaaba and the smartphone revolution" in Paul Rollier, Kathinka Frøystad and Arild Engelsen Ruud edited, 'Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia'; London: UCL Press, 2019, pp. 123-148.

১০. Giles Tillotson, 'Taj Mahal'; Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2008, p. 14.

১১. পুরুষোত্তম নাগেশ ওক, 'তাজমহল: তেজোমহালয় শিব মন্দির হৈ'; নঈ দিল্লী: হিন্দী সাহিত্য সদন, ২০০৭।

১২. 'Gazetteer of the Province of Oudh, Vol. I A to G'; Lucknow: The Oudh Government Press, 1877, pp. 111-113.

১৩. Shahid Amin, 'Conquest and Community: The Afterlife of Warrior Saint Ghazi Miyan'; Chicago: The University of Chicago Press, 2015, p. 22.

১৪. Ibid, pp. 32-39.

১৫. Badri Narayan, 'Fascinating Hindutva: Saffron Politics and Dalit Mobilisation'; New Delhi: Sage Publications India, 2009, p. 86.

১৬. 'Gazetteer of the Province of Oudh, Vol. I A to G', p. 111.

১৭. Badri Narayan, 'Fascinating Hindutva: Saffron Politics and Dalit Mobilisation', pp. 86-88.

১৮. Ibid, pp. 92-98.

১৯. বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড'; কলিকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬, পৃ. ২০৪-২০৫।

২০. তদেব, পৃ. ২০৮।

২১. স্নেহাংশু মজুমদার, "মহারাজা বিক্রমজিৎ ঘোষ – বাঙ্গালার হিন্দু যোদ্ধা যিনি দিল্লির সুলতানদের সতেরো বার পরাজিত করেন", 'কাঞ্জিক', জুন ১৭, ২০২২ [https://kanjik.net/bengals-triumphal-success-bikramjit/]।

২২. Frances W. Pritchett, "The World of Amar Chitra Katha" in Lawrence A. Babb and Susan S. Wadley edited, 'Media and the Transformation of Religion in South Asia'; Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995, pp. 76-106.

২৩. Yagya Sharma, 'Prithviraj Chauhan: A Legend of Valour and Chivalry, Amar Chitra Katha, Vol. 604'; Mumbai: Amar Chitra Katha, 2016, pp. 22-32.

২৪. 'Ranjit Singh: The Lion of Punjab, Amar Chitra Katha, Vol. 726'; Bombay: India Book House, 1974, p. 16.

২৫. Adurthi Subba Rao, 'Veer Savarkar: He Fought for Human Dignity and Freedom, Amar Chitra Katha, Vol. 309'; Bombay: India Book House, 1984, p. 30.

২৬. Vaibhav Purandare, 'Savarkar: The True Story of the Father of Hindutva'; New Delhi: Juggernaut Books, 2019.

২৭. Adurthi Subba Rao, 'Veer Savarkar: He Fought for Human Dignity and Freedom', p. 32.

২৮. Daniela Berti, "The Memory of Gods: From a Secret Autobiography to a Nationalistic Project" in 'Indian Folklife, Serial No. 24, October 2006'; Chennai: National Folklore Support Centre, 2006, pp. 16-17.

২৯. T.P. Verma edited, 'Itihas Darpan, Volume XIX (1)'; New Delhi: Akhil Bharatiya Itihas

Sankalan Yojana, 2014.

৩০. Daniela Berti, “Hindu nationalists and local History: From ideology to local lore” in ‘Rivista di Studi Sudasiatici, Vol. II’; Firenze University Press, 2007, pp. 21-26.

৩১. Ibid, pp. 13-14.

৩২. Richard Salomon, ‘Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions, Prakrit, and the Other Indo-Aryan Languages’; New York: Oxford University Press, 1998, pp. 180-181.

৩৩. মোরোপন্ত নীলকণ্ঠ পিংগলে, “নয়ে সিরে সে ইতিহাস সংকলন কী আবশ্যকতা”, ‘ইতিহাস দর্পণ: ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা কী শোধ পত্রিকা, প্রথম অঙ্ক, যুগাব্দ ৫০৯৬, মঈ ১৯৯৪’; নঈ দিল্লী: মহামন্ত্রী, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা সমিতি, ১৯৯৪, পৃ. ১৩।

৩৪. ঠাকুর প্রসাদ বর্মা, “ভারতীয় কালগণনা ওয় ইতিহাস সংকলন”, ‘ইতিহাস দর্পণ: ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা কী শোধ পত্রিকা, প্রথম অঙ্ক, যুগাব্দ ৫০৯৬, মঈ ১৯৯৪’; নঈ দিল্লী: মহামন্ত্রী, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা সমিতি, ১৯৯৪, পৃ. ৩১-৩৬।

৩৫. Padmaja Nair, ‘Religious Political Parties and their Welfare Work: Relations between the RSS, the Bharatiya Janata Party and the Vidya Bharati Schools in India’; International Development Department, University of Birmingham, 2009, p. 52.

৩৬. Snigdhendu Bhattacharya, “How one-teacher Ekal schools helped the spread of Hindutva in rural West Bengal” in ‘The Caravan, 10 October, 2020’; [https://caravanmagazine.in/politics/ekal-vidyalaya-abhiyan-rss-fts-vhp-hindutva-west-bengal-trinamool-bjp]

৩৭. লজ্জারাম তোমর, ‘ভারতীয় শিক্ষা কে মূল তত্ত্ব’; নয়ী দিল্লী: সুরুচি প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ. ৩৯-৪০।

হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম

The Cyber Blog India

১৯৮৮ সালে এডওয়ার্ড স্যামুয়েল হারমান ও নোয়াম চমস্কির লেখা 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অফ দ্য মাস মিডিয়া' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। কীভাবে একটি সুপরিকল্পিত প্রচারণার নকশা (প্রোপাগান্ডা মডেল) অনুযায়ী গণ-মাধ্যমকে ব্যবহার করে নাগরিকদের মধ্যে কোনও একটি বিশেষ মতাদর্শের প্রতি সম্মতির নির্মাণ করা হয়, এই বইটিতে সে বিষয়ে নিয়ে সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১] বিশ শতকের শেষ দিক থেকেই আন্তর্জাল ও সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক মাধ্যমেও এই একই রকম প্রচারণার নকশা ব্যবহার করে সম্মতি নির্মাণের জন্য ব্যবহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ও একই ধরনের প্রচারের নকশার সাহায্য নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গণতান্ত্রিক ধারণার বিরোধিতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ, ধর্মীয় মেরুকরণ, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী ধারণার বিরোধিতা ও শ্রমজীবি মানুষের অধিকার হরণের মতো ধারণার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশে কাজ করে চলেছে।

মিথ্যা তথ্যের কারখানা

একেবারে এই বছর (২০২৪) থেকেই শুরু করা যাক। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম কয়েক দিন আগে প্রকাশ করেছে 'দ্য গ্লোবাল রিস্কস রিপোর্ট ২০২৪'। এই সংস্থা তাদের সমীক্ষার ভিত্তিতে আগামী দিনে যে সম্ভাব্য বিপদগুলির উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম মিথ্যা তথ্য প্রচার। মিথ্যা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক মেরুকরণ এবং তার পরিণামে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবিশ্বাসের আবহ সৃষ্টি পৃথিবীর কিছু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আশু বিপদ হিসাবে বলে এই প্রতিবেদনে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বিশ্বের সব দেশগুলির মধ্যে মিথ্যা তথ্য প্রচারের বিপদ ভারতে সর্বাধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, ভারতের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের কাছে আন্তর্জাল পৌঁছে যাওয়ার ফলে সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে তাঁদের কাছে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রচুর মিথ্যা তথ্য পৌঁছে দেওয়া হবে। শুধু ভারত নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের নির্বাচনেও মিথ্যা তথ্যের রমরমার সম্ভাবনার কথা এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি সামাজিক মাধ্যমের কথা বিশেষভাবে এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে - হোয়াটসঅ্যাপ ও তার চীনা প্রতিরূপ উইচ্যাট। এই প্রতিবেদনে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে – সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা লাভ।[২]

ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমের উপর প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বা হিন্দুত্ববাদ প্রভাবিত ব্যক্তিদের হাতে। বিগত

এক দশকের বেশি সময় ধরে হোয়াটসঅ্যাপ গোষ্ঠীগুলিতে ধর্মীয় উস্কানিমূলক মিথ্যা প্রচার আমরা সকলেই দেখে অভ্যস্ত। বিগত কয়েক বছর ধরে এদের ভারতের লোকসভা নির্বাচন ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনগুলির আগে ভোটারদের ধর্মীয় মেরুকরণ করতে উঠে পড়ে লাগতে দেখা গিয়েছে।[৩] বিগত কয়েক বছরে ছবি ও ভিডিওকে সম্পাদনা করে বা তার সঙ্গে অন্য একটি কাহিনি সংযুক্ত করে হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে প্রচার করার বহু সংখ্যক ঘটনার কথা জানা গিয়েছে।[৪] অল্ট নিউজের মতো ভারতের সত্য যাচাই করার ওয়েবসাইটগুলির দৌলতে মিথ্যা তথ্য প্রচার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আজ আন্তর্জালে সহজলভ্য। হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা সংগঠিত ভাবে প্রচারিত সম্পাদিত ছবি ও ভিডিওগুলি মূলত উস্কানিমূলক ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের চরিত্রহনন, প্রধানত দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও ইতিহাসের তথ্যকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপনা বা কল্পিত ইতিহাসকে বাস্তব বলে প্রমাণের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। ছবি ও ভিডিওকে কৃত্রিম মেধার সাহায্য নিয়ে পরিবর্তন করার নতুন প্রযুক্তি ‘গভীর নকল’ (ডিপফেক) নামে পরিচিত। এই নতুন প্রযুক্তি মিথ্যা তথ্যকে এত বিশ্বসনীয় করে তুলতে সক্ষম যে অত্যন্ত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও এর দ্বারা প্রভাবিত হন। ভারতের মিথ্যা তথ্যের কারখানায় এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে।

‘রামসেতু’ – ছদ্ম-ইতিহাসের নির্মাণ

সামাজিক মাধ্যমে ছবি বা ভিডিওর সাহায্য নিয়ে কীভাবে কল্পিত কাহিনিকে বাস্তব ইতিহাস বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, তার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ রামসেতুর কাহিনি। ২০১৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সায়েন্স চ্যানেল’ নামের একটি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক তাদের ‘হোয়াট অন আর্থ’ নামের একটি সিরিজের ‘এনশ্যেন্ট ল্যান্ড ব্রীজ’ শিরোনামের পরবর্তী পর্বের আড়াই মিনিটের অংশের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে। এই আড়াই মিনিটের অংশে দেখা যায়, ভারতের পাম্বন দ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপের মধ্যে পক প্রণালীতে রামসেতু বা অ্যাডামস ব্রীজ নামে পরিচিত ৪৮ কিমি দীর্ঘ চুনাপাথরের একটি প্রাকৃতিক নিমজ্জিত শৈলচূড়ার সারি সম্পর্কে এক মার্কিন প্রত্নতত্ত্ববিদ চেলসি রোজ বলছেন যে, বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষায় জানা গিয়েছে ঐ নিমজ্জিত শৈলশ্রেণির পাথরগুলির বয়স ৭০০০ বছর কিন্তু তার নীচে সমুদ্রতলের বালির বয়স ৪০০০ বছর এবং কীভাবে এই পাথরগুলি এখানে পৌঁছালো, তাও রহস্যময়। এই ভিডিওতে সমুদ্রে নিমজ্জিত এই শৈলশ্রেণির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, ন্যাশনাল এয়ারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নাসা) উপগ্রহ থেকে নেওয়া কয়েকটি চিত্রও প্রদর্শিত হয়। টুইটারে এই ভিডিওটি প্রচারিত হওয়ার পর, ভারতের টেলিভিশন সংবাদমাধ্যমে এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে পুনঃপ্রচারিত হয়। সম্পূর্ণ পর্বটি আদৌ কখনও প্রচারিত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু এই আড়াই মিনিটের ভিডিওতে অংশগ্রহণকারী তিন বিদ্বানের কেউই রামসেতু মনুষ্যনির্মিত বলে প্রমাণিত এ কথা উল্লেখ করেননি, শুধু রামায়ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ভারতের সংবাদমাধ্যমে ও সামাজিক মাধ্যমে মার্কিন বিজ্ঞানীরা রামসেতু রামের নির্মিত এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বলে বেশ কিছু দিন ধরে প্রচার চলে।[৫]

একুশ শতকের ভারতে রামায়ণের রামসেতুর কাহিনি কীভাবে আজ বাস্তব ইতিহাস বলে সরকারিভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তার ইতিহাসও এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যাক। আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নাসার উপগ্রহ চিত্রগুলি ২০০২ সালে ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলি এই চিত্রগুলিকে রাম কর্তৃক নির্মিত সেতুর অবশেষের চিত্র বলে দাবি করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে ভারত সরকারের কয়লা ও খনি দপ্তর ভারতীয়

ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণকে রামসেতুর উৎপত্তি নিয়ে প্রত্নভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়।[৬] 'রামেশ্বরম প্রকল্প' নামে অভিহিত এই অনুসন্ধানের ফলাফল আজও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু, ২০১৮ সালের ১৯ মার্চ ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভায় ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দপ্তরের মন্ত্রী হর্ষবর্ধন এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫ সালে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ রামেশ্বরম, ধনুষ্কোটি ও আদমের সেতুর (রামসেতু) আশেপাশে অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু, ভৌগোলিক ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ ও ভূমির অভ্যন্তরে ছেদ করে সংগৃহীত তথ্য থেকে ধনুষ্কোটির প্রান্ত ও আদমের সেতুর মধ্যবর্তী অংশে ভারতের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের অন্তর্গত বর্তমান সমুদ্রতলে বা ভূগর্ভে মানব নির্মিত কাঠামোর অস্তিত্বের কোন প্রমাণের ইঙ্গিত খুঁজে বার করা যায়নি।[৭]

২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তত্কালীন কেন্দ্রীয় সরকার পক প্রণালীতে খনন করে জাহাজ চলাচলের পথ সুগম করার জন্য গঠিত সেতুসমুদ্রম প্রকল্পকে অনুমোদন করে, এবং ২০০৪ সালে নবনির্বাচিত সরকারের অর্থমন্ত্রী এর খরচ মেটাবার জন্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে খননের কাজ শুরু হয়। কিন্তু তার আগেই ২০০৬ সালের ৬ এপ্রিল রাম নবমীর দিন সংঘের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলি ভারত জুড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। এই বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর সংঘ পরিবারভুক্ত হিন্দু মুন্নানি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা রাম গোপালনের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল তাঁদের মতে সরকার দ্বারা 'শ্রীরামসেতু' বিলুপ্ত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভের কথা রাষ্ট্রপতিকে গিয়ে জানান। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চার শংকরাচার্য রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁদের মতে রামসেতু ধবংস করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। পরের বছর কয়েকটি বিদেশী সংগঠনও এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ২০০৭ সালের মে মাসে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী মাদ্রাজ হাই কোর্টে ভারত সরকারকে সেতুসমুদ্রম প্রকল্প রূপায়ণের সময় 'রামসেতু'র কোনও রকম ক্ষতি করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য একটি মামলা রুজু করেন। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত সরকার সুপ্রিম

কোর্টে একটি হলফনামা পেশ করে রামসেতু প্রাকৃতিকভাবে নির্মিত বলে জানায়। ১২ সেপ্টেম্বর

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের পক্ষ থেকে আর একটি হলফনামা সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হয়। সেই হলফনামায় বলা হয়, বাল্মীকি রামায়ণ, তুলসীদাসের রামচরিতমানস বা অন্য পুরাকথা বিষয়ক গ্রন্থগুলি ভারতের সাহিত্যের প্রাচীন অংশের অন্তর্ভুক্ত হলেও, সেই গ্রন্থগুলিকে সেখানে বর্ণিত সমস্ত চরিত্র বা ঘটনার বাস্তবিকতার অবিসংবাদী প্রমাণসূচক ঐতিহাসিক নথি বলা যায় না। এই হলফনামার বিরুদ্ধে রামসেতু রক্ষা মঞ্চ নামের একটি সংঘ পরিবারভুক্ত সংগঠন ভারতের বেশ কয়েকটি স্থানে রেল ও পথ অবরোধ করে। সংঘ পরিবারভুক্ত সংগঠনগুলির প্রতিবাদের পর ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার সুপ্রিম কোর্ট থেকে দুটি হলফনামাই প্রত্যাহার করে নেয়। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের যে দু'জন কর্মকর্তা হলফনামার খসড়া রচনা করেছিলেন, তাঁদের নিলম্বিত করা হয়।[৮] ভারত সরকার কার্যত সংঘ পরিবারের কাছে আত্মসমর্পণ করে রামসেতুর গঠনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে পুরাকথাকে স্বীকার করে নেন।

সংবাদ প্রতিদিন

'সেতুসমুদ্রম' রুখতে অবরোধ পরিষদের

'রাম' এবং 'রামায়ন' এর অস্তিত্বই নেই, জানাল কেন্দ্র

14-09-07

2007

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: 'রামচন্দ্র' এবং 'রামায়ণ' এর কোনও অস্তিত্ব নেই ইতিহাসে। রামায়ণের অন্য চরিত্রগুলিও নিছকই কাল্পনিক, মহাকাব্যের চরিত্রমাত্র। ইতিহাসে এমন কোনও চরিত্রর সন্ধান মেলেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব পর্ষদ (এএসআই) এর তরফে এক হলফনামা পেশ করে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এই কথা জানানো হয়েছে। তামিলনাড়ুতে প্রস্তাবিত সেতুসমুদ্রম প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে যেদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেশের কিছু অঞ্চলে বিক্ষোভ-অবরোধ দেখাল, ঠিক সেদিনই পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে এই হলফনামা দিল। আমেরিকার নাসা-র উসকানিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দাবি করেছে, সেতুসমুদ্রম প্রকল্প হলে 'রামসেতু' ধ্বংস হবে। 'রামসেতু' বলতে রামায়ণে বানরদলের তৈরি এক কাল্পনিক সেতুর কথাই বলা হয়। রামায়ণের কাহিনি অনুযায়ী এই সেতু তৈরি করেই বানর বাহিনী রাবণের হাত

২০১৪ সালে নতুন সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর, ২০১৮ সালের ১৬ মার্চ ভারত সরকার একটি হলফনামা পেশ করে রামসেতুর কোনও ক্ষতি করা হবে না ও সেতুসমুদ্রম প্রকল্পের জন্য বিকল্প পথ খোঁজ করা হবে বলে জানায়।[৯] ২০১৯ সালের ২৭ আগস্ট, ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল 'নিঃশঙ্ক' খড়গপুর আইআইটির ৬৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, রামসেতু ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরাই নির্মাণ করেছেন; কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন বা জার্মানির প্রযুক্তিবিদরা তো আর এই সেতু নির্মাণ করেননি।[১০] হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে ভারতের উচ্চশিক্ষিত নাগরিকদের চেতনাতেও পুরাকথা আর ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হয়েছে, একুশ শতকের প্রথম দুই দশকের এই রামসেতু সংক্রান্ত ঘটনাবলি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রেম যখন অপরাধ

একুশ শতকে ভারতের নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষকে প্রসারিত করার জন্য সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ দিন ধরে লাগাতার পরিকল্পিত প্রচারের একটি সুপরিচিত উদাহরণ 'লাভ জিহাদ'-এর কাহিনি। এই ধরনের কাহিনির প্রচারকদের মতে, কোনও ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষের কোনও হিন্দু নারীকে বিবাহ করার একমাত্র উদ্দেশ্য ঠকিয়ে বিয়ে করার পর জোর করে ধর্মান্তরণ, সেই কারণে এই ধরনের বিবাহকে সামাজিক মাধ্যমের লেখকরা ইংরেজি লাভ ও আরবি জিহাদ শব্দ দুটিকে জুড়ে একটি নতুন জোড়-কলম শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে থাকে।

'লাভ জিহাদ' কথাটির কোনও আইনি সংজ্ঞা এখনও পর্যন্ত নেই। বর্তমানে ভারতের ১০টি রাজ্যে ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইন বলবৎ থাকলেও কোনও আইনেই

'লাভ জিহাদ' কথাটির উল্লেখ নেই। খুব সম্ভবত, ২০০৭ সালে কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি' প্রথম 'লাভ জিহাদ' কথাটির প্রয়োগ করে। এরপর, ২০০৯ সালে কেরালার ক্যাথলিক বিশপস কাউন্সিল এই কথাটি আবার ব্যবহার করে।[১১]

সামাজিক মাধ্যমে বিগত দশকের গোড়া থেকেই দুটি পৃথক ধর্মাবলম্বী পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সংবাদকে 'লাভ জিহাদ'-এর কাহিনিতে রূপান্তরণ করে পেশ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফেসবুক মাধ্যমে 'লাভ জিহাদ' নিয়ে প্রচারের জন্য ইংরেজিতে সৃষ্ট পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে উল্লেখনীয়, ২০১৪ সালের ২৭ আগস্ট

সৃষ্ট 'গার্লস – বিওয়ার অফ লাভ জিহাদ' (২৯ হাজার অনুসরণকারী), ২০১৭ সালের ৫ নভেম্বর সৃষ্ট 'লাভ জিহাদ বুলেটিন' (১৪ হাজার অনুসরণকারী), ২০১২ সালের ৬ অক্টোবর সৃষ্ট 'হিন্দু এগেইনস্ট লাভ জিহাদ' (৪২০০ অনুসরণকারী) এবং ২০১১ সালের ২০ জুলাই সৃষ্ট 'প্রোটেস্ট এগেইনস্ট লাভ জিহাদ' (৪৮০০ অনুসরণকারী)। হিন্দিতে 'লাভ জিহাদ' নিয়ে প্রচারের জন্য একটি উল্লেখনীয় গোষ্ঠী 'লব জিহাদ বিরোধী' (৯৫০০ সদস্য)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'হিন্দু বিশ্ব' নামের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সংগঠনের হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকার ২০২০ সালের ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি একটি বিশেষ সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, সমস্ত সংখ্যাটি 'লব জিহাদ' নিয়ে লেখা। এর প্রচ্ছদে লেখা ছিল, 'লব জিহাদ সে দেশ বচায়েঁ, আও অলখ জগায়েঁ'। এই পত্রিকায় ২০১১ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ১৪৭টি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার ৭৩টি উল্লেখ (বা ৭২টি, কারণ এই তালিকায় ৯ সংখ্যক উল্লেখটি নেই) ভারতের বাইরে কৃত কোনও অপরাধ, লাভ জিহাদ নিয়ে কোনও প্রতিবেদন বা তালিকা অথবা কোনও রাজনৈতিক নেতার লাভ জিহাদ নিয়ে বক্তব্য। বাকি ৭৪টি উল্লেখ ২৫ রকম বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের তালিকা, যেখানে অভিযুক্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষ আর কথিত শিকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারী। এর মধ্যে কেবল দু' রকমের অপরাধকে 'লাভ জিহাদ' সংক্রান্ত দাবির সঙ্গে যুক্ত করা যায় – ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষের পরিচয় লুকিয়ে হিন্দু নারীকে বিবাহ ও বিবাহের পর হিন্দু নারীকে জোর করে ধর্মান্তরণ। এর মধ্যে ৩৬টি প্রতিবেদনে ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষের পরিচয় লুকিয়ে হিন্দু নারীকে বিবাহের অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। এই ৩৬টি প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিযোগগুলির ক্ষেত্রে অভিযোগের সমর্থনে কোনও নিরপেক্ষ প্রমাণের উল্লেখ এই পত্রিকায় নেই বা অভিযোগগুলির আইনি তদন্তের চূড়ান্ত ফলের বিষয়েও পত্রিকায় কিছু লেখা হয়নি; একটি ক্ষেত্রে তো

প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ তথ্যও উল্লেখ করা হয়নি।[১২]

'লাভ জেহাদ' কথাটিকে জনপ্রিয় করে তোলার পর সামাজিক মাধ্যমে ও সংবাদ মাধ্যমে সমতুল্য আরও কয়েকটি জোড়-কলম শব্দকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস শুরু হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বোধ হয় 'পপুলেশন জিহাদ'। ভারতের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যা নাকি এত দ্রুত বেড়ে চলেছে যে শিগগিরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে হিন্দুত্ববাদীদের এই প্রচার দীর্ঘ দিনের। সেই প্রচারেরই নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'পপুলেশন জিহাদ'। বহু সংখ্যক শব্দের সঙ্গে 'জেহাদ' কথাটি জুড়ে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচারের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন দেখা যায় ২০২১ সালের ১১ মার্চ তারিখের হিন্দি 'জি নিউজ' সংবাদ চ্যানেলের 'ডিএনএ (ডেইলি নিউজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস)' নামের অনুষ্ঠানে। 'জম্মু, জমিন ঔর জেহাদ' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে সংযোজক সুধীর চৌধরী একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে 'জেহাদ' সম্পর্কে তাঁর কল্পকাহিনি বোঝাতে শুরু করে প্রথমেই তাঁর কল্পিত জেহাদগুলিকে 'কট্টর জেহাদ' ও 'বৈচারিক জেহাদ' নামে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। সুধীর চৌধরীর কল্পিত 'বৈচারিক জেহাদ' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত 'আর্থিক জেহাদ', 'ঐতিহাসিক জেহাদ', 'মিডিয়া জেহাদ', 'ফিল্ম ঔর সঙ্গীত জেহাদ' এবং ধর্মনিরপেক্ষতা কা জেহাদ' আর তাঁর কল্পিত 'কট্টর জেহাদ' শ্রেণিতে রয়েছে 'জনসংখ্যা জেহাদ' (অর্থাৎ 'পপুলেশন জিহাদ'), 'লব জেহাদ' (অর্থাৎ 'লাভ জিহাদ'), 'জমিন জেহাদ', 'শিক্ষা জেহাদ', 'পীড়িত জেহাদ' ও 'সিধা জেহাদ'।১৩ সুধীর চৌধরীর দেখাদেখি আজকাল কিছু ইংরেজি ও হিন্দি সংবাদ চ্যানেলের সংযোজকরা কার্যত যে কোনও বিষয়ে সরকারি নীতির বিরোধিতাকে জিহাদ বলে অভিহিত করতে শুরু করে দিয়েছেন।

'সংখ্যালঘু তোষণ' ও 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা'

বিংশ শতকের প্রথম থেকেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি ভারতে সংখ্যালঘু তোষণের মিথটি গড়ে তুলতে প্রভূত প্রয়াস চালিয়েছে। এর পাশাপাশি, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত, যখন ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল, 'সিউডো-সেকুলারিজম' (ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা) বলে একটি শব্দকে তারা জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। 'সিউডো-সেকুলারিজম' বা 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন কেরালার এক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী যাজক, তাঁর ১৯৫১ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে।[১৪] এরপর, ভারতের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের প্রচারে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে এই শব্দটির বারংবার প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। বিগত বেশ কিছু কাল যাতৎ অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকেই হাস্যাস্পদ করে তোলার জন্য 'সিকুলার' (সেকুলার শব্দটির ব্যঙ্গাত্মক

পরিবর্তিত রূপ) কথাটিরও ব্যবহার করতে শুরু হয়েছে। আজকের ভারতে অবশ্য ব্যাপক ধর্মীয় বিদ্বেষের আবহে এই 'সিউডো-সেকুলার' ও 'সিকুলার' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার আর দেখা যাচ্ছে না। বিগত এক দশকে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও পরিবর্তন ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালে, ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচারের বিরোধীদের জন্য 'লিবটার্ড' (লিবারেল ও রিটার্ড শব্দদ্বয়ের সংযোগে সৃষ্ট মার্কিন অপশব্দ) কথাটির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত সংখ্যালঘু তোষণের অসংখ্য কল্পিত কাহিনির মধ্যে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ২০০৬ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ৫২তম বৈঠকে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের কল্পিত অভিযোগকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর এই ভাষণের একটি খণ্ডিত ও বিকৃত রূপ কয়েকটি সংবাদপত্রে ও সামাজিক মাধ্যমে ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি, আমাদের যৌথ অগ্রাধিকারসমূহ স্পষ্ট। কৃষি, সেচ ও জলসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ পরিকাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ, এবং, তফশিলি জাতি/তফসিলি জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু এবং মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি সমেত সাধারণ পরিকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ। তফসিলি জাতি এবং জনজাতিদের জন্য পরিকল্পনার অংশগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন রয়েছে। সংখ্যালঘুরা, বিশেষত মুসলিম সংখ্যালঘুরা, যাতে উন্নয়নের ফলের ন্যায়সঙ্গত ভাগ পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তাদের সম্পদের উপর প্রথম দাবি থাকা উচিত।"[১৫] 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' সংবাদপত্র এই ভাষণের খবরটিকে 'মুসলিমদের সম্পদের উপর প্রথম দাবি থাকা উচিত: প্রধানমন্ত্রী' এই বিকৃত শিরোনামে প্রকাশ করে।[১৬] অথচ এই একই প্রকাশনা সংস্থার 'দ্য ইকনমিক টাইমস' সংবাদপত্রে কিন্তু যথাযথ শিরোনাম 'সংখ্যালঘুদের সম্পদের উপর প্রথম দাবি থাকা উচিত: প্রধানমন্ত্রী' ব্যবহার করা হয়েছিল।[১৭] বিগত দুই দশকে সামাজিক মাধ্যমে 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা'র উদাহরণ হিসাবে ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ না করে এই বিকৃত বাক্যটি বহুবার ব্যবহার হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর অর্থনীতি – কে এগিয়ে?

২০২৩ সালের ৯ ডিসেম্বর মুম্বইয়ের 'স্কুল অফ ইন্ট্রিনসিক কম্পাউন্ডিং' বা 'এসওআইসি' নামের একটি সংস্থা তাদের এক্স (অর্থাৎ টুইটার) সামাজিক মাধ্যমের পৃষ্ঠায় ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উত্পাদনের মধ্যে কোন রাজ্যে কত শতাংশ উত্পাদন হয় তা একটি মানচিত্রের আকারে প্রকাশ করে। এই মানচিত্র অনুযায়ী মোট অভ্যন্তরীণ

উত্পাদনের ১৫.৭% মহারাষ্ট্রে, ৯.২% উত্তরপ্রদেশে ও ৯.১% তামিলনাড়ুতে হয়।[১৮] এই মানচিত্রের তথ্যসূত্র হিসাবে কোনও সরকারি তথ্যের পরিবর্তে 'ক্রেডিট লিওনে সিকিউরিটিস এশিয়া' বা সিএলএসএ নামের একটি সংস্থার ওয়েবসাইটের উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও ঐ সংস্থার ওয়েবসাইটে এই সম্পর্কিত কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই মানচিত্রে লাদাখ, দমন ও দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি, লক্ষদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সম্পর্কে কোনও তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও বাকি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ উত্পাদনের প্রদত্ত শতাংশ যোগ করলে ১০৮.৬% হয়। স্পষ্টত রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্মিত এহেন মানচিত্রটি প্রকাশের পর ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে ও সামাজিক মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ তামিলনাড়ুকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে বলে ব্যাপক হারে প্রচার শুরু হয়ে যায়। সংবাদসংস্থা 'এএনআই' ও 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'দ্য ইকনমিক টাইমস', 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' প্রমুখ সংবাদপত্র প্রায় একই রকম খবর প্রকাশ করে। কিন্তু কোনও সংবাদপত্রই তথ্য যাচাই করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উত্পাদন সম্পর্কে সর্বশেষ সরকারি তথ্য পাওয়া যায় ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়। এই পুস্তিকা অনুযায়ী বর্তমান মূল্যমানের ভিত্তিতে ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে তামিলনাড়ুর মোট অভ্যন্তরীণ উত্পাদন ছিল ২৩.৬৪ লাখ কোটি টাকা ও উত্তরপ্রদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উত্পাদন ছিল ২২.৫৭ লাখ কোটি টাকা।১৯ ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে ভারতের রাজ্যগুলির মোট অভ্যন্তরীণ উত্পাদন সম্পর্কে ২০২৩ সালের ৯ নভেম্বর 'ফোর্বস ইন্ডিয়া'র ওয়েবসাইটে একটি অনুমান প্রকাশিত হয়।

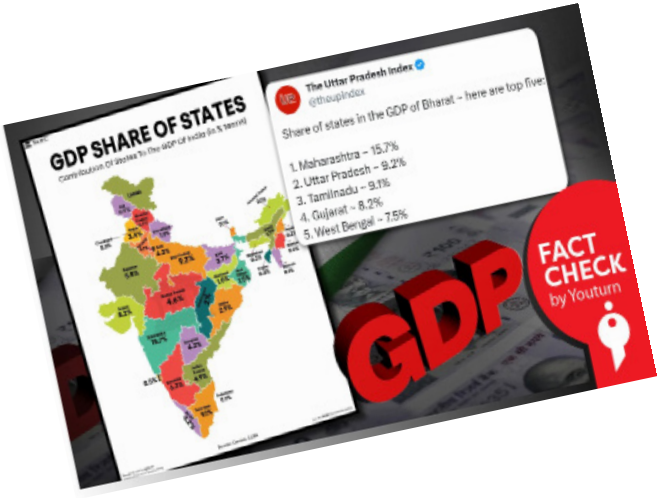

ভুয়া ফ্যাক্ট-চেকের নামে 'স্কুল অফ ইন্ট্রিনসিক কম্পাউন্ডিং' প্রকাশিত উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তিহীন পরিসংখ্যান প্রচার

ওয়েবসাইটে এই অনুমানের তথ্যসূত্র হিসাবে ২০২৩-২৪ সালের বাজেটের অনুমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই অনুমান অনুসারে ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে তামিলনাড়ুর মোট অভ্যন্তরীণ উত্পাদন ২৮.৩ লাখ কোটি টাকা ও উত্তরপ্রদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উত্পাদন ২৪.৩৯ লাখ কোটি টাকা হবে।২০ অর্থাৎ এক কথায় 'স্কুল অফ ইন্ট্রিনসিক কম্পাউন্ডিং' প্রকাশিত উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিসংখ্যানটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সাম্প্রতিককালে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়কে কীভাবে অর্থনৈতিক মিথ গড়ে তুলতে আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে, এই উদাহরণটি তার একটি প্রকৃষ্ট নমুনা।

টীকা

১. Edward S. Herman and Noam Chomsky, 'Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media'; New York: Pantheon Books, 1988.

২. 'The Global Risks Report 2024, 19th edition, Insight Report'; Geneva: World Economic Forum, 2024 [https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/].

৩. Gerry Shih, "Inside the vast digital campaign by Hindu nationalists to inflame India" in 'The Washington Post'; 26 September 2023 [https://www.washingtonpost.com/world/ 2023/09/26/hindu-nationalist-social-media-hate-campaign/].

৪. Kiran Garimella and Dean Eckles, "Images and Misinformation in Political Groups: Evidence from WhatsApp in India" in 'The Harvard Kennedy School Misinformation Review, Volume 1, Issue 5'; 2020 [https://doi.org/10.37016/mr-2020-030].

৫. Murali Krishnan, "A bridge that Lord Ram built - myth or reality?" in 'DW'; 14 December 2017 [https://www.dw.com/en/a-bridge-that-lord-ram-built-myth-or-reality/a-41797300].

৬. Arup K. Chatterjee, 'Adam's Bridge: Sacrality, Performance, and Heritage of an Oceanic Marvel'; London and New York: Routledge, 2024, pp. 134-135.

৭. "Geological Studies of The Formation Between Pamban and Sri Lanka", 'Government of India, Ministry of Earth Sciences, Rajya Sabha, Unstarred Question

No. 2610, To be Answered on Monday, March 19, 2018';[https://sansad.in/getFile/annex/245/Au2610.pdf?source=pqars].

৮. Arup K. Chatterjee, 'Adam's Bridge: Sacrality, Performance, and Heritage of an Oceanic Marvel', pp. 135-139.

৯. Kumar Shakti Shekhar, "Affidavit on Ram Setu in Supreme Court: Modi sarkar fulfils 2014 manifesto promise" in 'India Today, March 16, 2018"; [https://www.indiatoday.in/india/story/affidavit-on-ram-setu-in-supreme-court-modi-sarkar-fulfils-2014-manifesto-promise-1190821-2018-03-16].

১০. Soumya Das, "Ram Setu built by Indian engineers: Union HRD Minister" in 'Deccan Herald, 27 August 2019';[https://www.deccanherald.com/india/ram-setu-built-by-indian-engineers-union-hrd-minister-757423.html]

১১. Sreenivasan Jain, Aruveetil Mariyam Alavi, and Supriya Sharma, 'Love Jihad and other Fictions'; New Delhi: Aleph Book Company, 2024.

১২. Ibid.

১৩. এই অনুষ্ঠানের ইউটিউবে সংযোগশৃঙ্খল: https://www.youtube.com/watch?v=R83Z_E6EM-0।

১৪. Anthony Elenjimittam, 'Philosophy and Action of the R.S.S. for the Hind Swaraj'; Bombay: The Laxmi Publications, 1951, p. 188.

১৫. 'PM's address at the Meeting of National Development Council 2006' [https://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=482].

১৬. "Muslims must have first claim on resources: PM" in 'The Times of India, December 9, 2006' [https://timesofindia.indiatimes.com/india/muslims-must-have-first-claim-on-resources-pm/articleshow/754937.cms].

১৭. "Minorities must have first claim on resources: PM" in 'The Economic Times, December 9, 2006' [https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/minorities-must-have-first-claim-on-resources-pm/articleshow/754218.cms].

১৮. এসওআইসি প্রকাশিত মানচিত্রটির এক্স (টুইটার) সামাজিক মাধ্যমে সংযোগশৃঙ্খল: https://twitter.com/soicfinance/status/1733457301678485700।

১৯. 'Handbook of Statistics on Indian States, 2022-23'; Mumbai: Reserve Bank of India, 2023, p. 70.

২০. "GDP of Indian states and union territories" in 'Forbes India, November 9, 2023'; [https://www.forbesindia.com/article/explainers/gdp-of-indian-states-union-territories/88157/1].

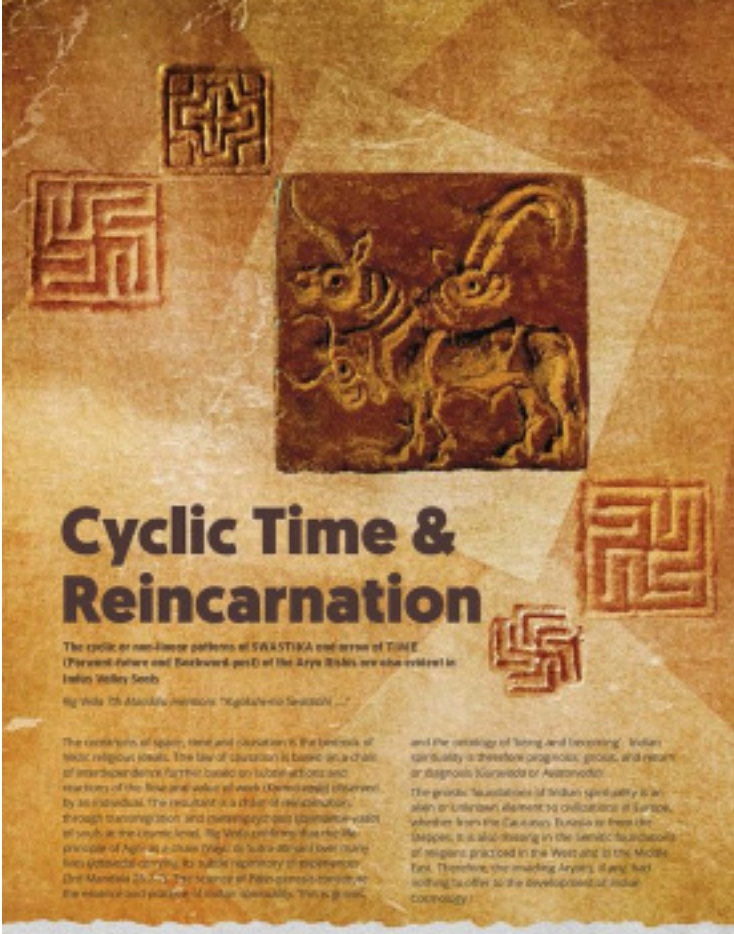

Cyclic Time & Reincarnation

The cyclic or non-linear patterns of SWASTIKA and arrow of TIME (Forward-future and Backward-past) of the Arya Rishis are also evident in Indus Valley Seals

[illegible]

February 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

২০২৩ সালের মে মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২০২২ সালের একটি সমীক্ষাতে জানা গিয়েছে ভারতে বর্তমানে ৭৫ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ নিয়মিত আন্তর্জাল (ইন্টারনেট) ব্যবহার করেন এবং ২০২৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৯০ কোটিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ইতিমধ্যেই নিয়মিত আন্তর্জাল ব্যবহার করছেন।[১] সোজা কথায়, ভারতের বিশাল সংখ্যক নাগরিকদের মধ্যে এক বিরাট অংশের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম প্রতি নিয়ত পৌঁছে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে প্রচারিত মিথ্যা রটনায় বিভ্রান্ত মানুষদের গণপিটুনির ফলে মৃত্যুর বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে।[২] সামাজিক মাধ্যমে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচারের ওভারডোজের পরিণাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি, আগামী দিনে এর পরিণাম আরও ভয়ংকর হতে পারে। যদি সংগঠিত ভাবে স্কুলে, কলেজে, কর্মক্ষেত্রে, পাড়া-মহল্লায় সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা না যায়, তাহলে রোয়ান্ডার ১৯৯৪ সালে গণহত্যার চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ভারতে ঘটে যেতে পারে। সারা পৃথিবীর সচেতন বিদ্বানরা ভারতে ধর্মীয় উন্মাদনা বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু, ভারতের নাগরিকরা যদি অবিলম্বে সর্বসমাবিষ্ট সমাজ গঠনের কাজে এগিয়ে না আসেন, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের একটি ধর্মীয় চরমপন্থী রাষ্ট্রে পরিবর্তিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান।

ভারতের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার ক্ষমতা উদ্গমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ইতিহাসের গবেষণা পত্র বা নিবন্ধ লেখার সময় আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করার যে দায় আজও ভারতের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্ররা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেন না, সেই দায় প্রথম থেকেই হিন্দুত্ববাদী লেখকদের ছিল না, আর এখনকার হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের তো কোনও দায়ই নেই। নির্বিচারে পুরাকথাকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পদ্ধতির সবচেয়ে উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম মানব বিবর্তন বা মানব পরিযানের মতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অস্বীকার করে এক প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত কাল্পনিক অতীতকে প্রকৃত মানব প্রাগিতিহাস হিসাবে নির্মাণ এবং ভারতের তরুণ প্রজন্মের বৃহৎ অংশের মধ্যে চেতনায় মিথ ও প্রাগিতিহাসের মধ্যে পার্থক্য প্রায় সম্পূর্ণ মুছে দেওয়ার কাজে বহু দূর পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্ভবত এই কাজকে আরও সহজ করার জন্য জাতীয় শিক্ষাগত অনুসন্ধান

ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এনসিইআরটি) ২০২২ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় বোর্ডের দশম শ্রেণির বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যক্রমের 'বংশগতি ও বিবর্তন' অধ্যায়টি থেকে মানব বিবর্তন সমেত সম্পূর্ণ বিবর্তন অংশটিই উড়িয়ে দিয়ে অধ্যায়টি নতুন অধ্যায়টির নতুন নামকরণ করেছে 'বংশগতি'।[৩]

'ভারতীয় জ্ঞানচর্চা পদ্ধতি'

২০২৩ সালের আগস্ট মাসের শেষে ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত একটি সংবাদ অনুযায়ী গুজরাত পুলিশ সুরাতে মিতুল ত্রিবেদী নামের এক ব্যক্তিকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। খুব সম্ভবত বাণিজ্যের স্নাতক মিতুল ত্রিবেদী চন্দ্রযান-৩-এর সফল অভিযানের পর কয়েকটি সাক্ষাৎকারের সময় নাকি দাবি করছিলেন, তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বিজ্ঞানী এবং লুনার ল্যান্ডার বিক্রম তাঁরই পরিকল্পিত। তিনি আরও দাবি করছিলেন, তিনি নাকি ইসরোর প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিভাগে পারদ শক্তিচালিত মহাকাশযান নিয়ে কর্মরত গবেষকদের একজন।[৪] ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার এই রকম কোনও বিভাগ বা গবেষণার অস্তিত্ব না থাকলেও মিতুল ত্রিবেদীকে একেবারে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ভীষ্ম স্কুল অফ ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পুণের ডেকান কলেজের প্রাক্তন উপাচার্য, প্রত্নতত্ত্ববিদ বসন্ত শিণ্ডেকে পরামর্শদাতা বলে উল্লেখ করা আছে। এই ওয়েবসাইটের একটি বিজ্ঞাপনে মিতুল ত্রিবেদীর পরিচয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার গডার্ড সেন্টারের বিজ্ঞানী ও ইসরোর পরামর্শদাতা। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফেসবুকের পৃষ্ঠার একটি পোস্ট থেকে জানা যায়, মিতুল ত্রিবেদী সেখানে ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতি অনুসারী বিমানবিদ্যা নামের একটি ৩ মাসের অন-লাইন পাঠক্রমে শিক্ষকতা করেছেন।[৫] এই পাঠক্রমে যেমন 'বিমানশাস্ত্র' গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত প্রাচীন বিমান সম্পর্কে উল্লেখ আছে, তেমনই উল্লেখ রয়েছে মরুৎসখা নামের পৃথিবীর 'প্রথম'

বিমানের। বৈদিক বিমানের নির্মাণ প্রকৌশল এবং মাধ্যাকর্ষণ-বিরোধী প্রযুক্তিও এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।[৬] প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত মিতুল ত্রিবেদী এবং তাঁর পড়ানো ছদ্ম-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ছদ্ম-ইতিহাসের পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম' অর্থাৎ 'ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতি' কথাটি এখনও ব্যাপক পরিচিতি লাভ না করলেও, এর সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানার প্রয়োজন আছে।

২০২০ সালের জুলাই মাসে ভারতের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকারের ক্যাবিনেটের অনুমোদন লাভ করে। এই শিক্ষা নীতিতে বহু সংখ্যক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে; এর মধ্যে 'ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতি' নামের একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন অত্যন্ত উল্লেখনীয়। এই ধারণার সঙ্গে পূর্ববর্তী জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকারের আমলে ২০০০ সালে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষাগত অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদের (এনসিইআরটি) 'বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো' পুস্তিকায় উল্লিখিত 'দেশজ জ্ঞান পদ্ধতি'র ধারণার মিল লক্ষণীয়। ঐ পুস্তিকায় 'দেশজ জ্ঞান পদ্ধতি' সম্পর্কে বলা হয়েছিল, "আজ, ভারতের দেশজ জ্ঞান পদ্ধতিসমূহের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পূর্ববর্তী যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি। আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্যের এক সর্বাঙ্গীণ প্রণালী হিসাবে এবং ভারতীয় মনস্তত্ত্ব পাশ্চাত্যের তুলনায় সম্পূর্ণতর শিক্ষাক্রম হিসাবে ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে।...একটি দেশজ ভারতীয় পাঠক্রম শ্রী অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাত্মা ফুলে, গান্ধী, (রবীন্দ্রনাথ) ঠাকুর, জাকির হুসেন, কৃষ্ণমূর্তি ও গিজুভাই বধেকার মতো দেশের চিন্তাবিদদের ভাবনাগুলিকে সম্মানিত করবে।"[৭]

২০২০ সালে প্রকাশিত ভারত সরকারের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির পুস্তিকায় বলা হয়েছে, "প্রাচীন ও সনাতন ভারতীয় জ্ঞান ও চিন্তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের আলোকে এই নীতি তৈরি করা হয়েছে।" ভারতীয় জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে, "প্রাচীন ভারতে কেবল সাংসারিক জীবন অথবা বিদ্যালয়ের পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির জন্য জ্ঞান অর্জন নয়, আত্মজ্ঞান ও মুক্তিকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করা হতো।" এই পুস্তিকায় আরও বলা হয়েছে, "আদিবাসী জ্ঞান ও শিক্ষার স্বদেশী ও পারম্পরিক পদ্ধতিগুলি সমেত ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থাসমূহ, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, যোগ, স্থাপত্যবিদ্যা, চিকিত্সাবিদ্যা, কৃষি, প্রযুক্তিবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।"[৮] অর্থাৎ, এক কথায়, শিক্ষার প্রায় সর্বক্ষেত্রে 'প্রাচীন ও সনাতন' ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে। সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির শিক্ষার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের একটি বিভাগ গঠন করা হয়েছে। ২০২৩ সালে

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের বাধ্যতামূলক অংশের ৫% ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির পাঠ্যক্রম গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে।[৯] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির যে মডেল পাঠক্রমের নির্দেশিকা জারি করেছে, সেই পাঠক্রমে ১৮টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১০] এর মধ্যে একটি বিষয়, ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে 'অর্গানাইজার' পত্রিকার ২০২৩ সালে ২৩ জুলাই সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে, "ইউজিসি ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির ভিত্তিতে একটি পাঠক্রম গঠন করেছে, যেখানে মহাভারত কালের কৃষি ও সেচ প্রযুক্তি, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত নিয়ে বৈদিক ধারণা, সুশ্রুতসংহিতায় বর্ণিত প্লাস্টিক অস্ত্রোপচার ও ছানির অস্ত্রোপচার ও রামায়ণে উল্লিখিত কৃষি পদ্ধতির মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।"[১১]

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির পাঠক্রম কী রকম হবে, তার স্বরূপ প্রথম দেখতে পাওয়া গিয়েছিল অখিল ভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত নতুন পাঠক্রমে। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পিত এই নতুন পাঠক্রমে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় শিক্ষা ঐতিহ্যের সার' শিক্ষার জন্য 'ভারতীয় বিদ্যা সার-১' ও 'ভারতীয় বিদ্যা সার-২' নামের দুটি ভাগে বিভক্ত একটি নতুন বাধ্যতামূলক বিষয়ের পাঠক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন পাঠক্রমের রচয়িতাদের মতে, "আধুনিক সমাজে দ্রুত প্রাযুক্তিক অগ্রগতি ও সামাজিক বিঘ্ন-ব্যাঘাতের সাথে সাথে যোগ বিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রজ্ঞার বীজকোষসমূহ থেকে প্রাপ্ত সর্বাঙ্গীণ জীবনশৈলীও গুরুত্বপূর্ণ" এবং সেই কারণে এই শিক্ষাক্রমের ঘোষিত লক্ষ্য "আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ভারতীয় ঐতিহ্যগত জ্ঞানের মূল বিষয়গুলিকে বোঝা, তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা" অর্জন। যে বিষয়গুলি এই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখনীয় বিষয় অষ্টাদশবিদ্যা – ৪টি বেদ, ৪টি উপবেদ (আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ) ৬টি বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও ছন্দ) এবং ৪টি উপাঙ্গ (ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, পুরাণ ও তর্কশাস্ত্র)।[১২]

অখিল ভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ 'ভারতীয় বিদ্যা সার-১' ও 'ভারতীয় বিদ্যা সার-২'-এর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব ভারতীয় বিদ্যা ভবনকে দেওয়ার পর, ২০১৮ সালে ঐ সংস্থা থেকে শিক্ষাক্রম দু'টির পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই দুই পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে কীভাবে ভারতের প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষার্থীদের ছদ্ম-বিজ্ঞান আর ছদ্ম-ইতিহাস শেখানোর আয়োজন করা হয়েছে।

ভারতীয় বিদ্যা ভবন থেকে প্রকাশিত 'ভারতীয় বিদ্যা সার-১' পাঠ্যপুস্তকের তিনটি অধ্যায় - 'বেদ, বেদাঙ্গ আদি বিদ্যাসমূহ', 'আধুনিক বিজ্ঞান ও এবং ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্য' এবং 'যোগ এবং সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদান্ত ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান চিনির মধ্যে কেবল কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মতো জড় পদার্থের কথা বলে, কিন্তু চিনির মধ্যে এ ছাড়াও যে চৈতন্যও আছে সে কথা বলে না। বিজ্ঞানে চৈতন্য পদার্থের বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। বেদান্ত অনেক আগেই নির্ণয় করেছে, প্রত্যেক বস্তুতে চৈতন্য অবস্থান করে। অতএব, যেখানেই আমরা জড় পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি, সেখানেই চৈতন্য পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও আবশ্যক।[১৩] এই অধ্যায়েরই অন্যত্র বলা হয়েছে, জৈন দর্শন হচ্ছে আত্মা ও পরমাণুর বিজ্ঞান, যাকে বর্তমান সময়ে কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলে এবং জৈন শ্রমণদের অ্যাটমিক ও মলিকিউলার ফিজিক্সেরও জ্ঞান ছিল।[১৪] এই অধ্যায়েরই আর এক স্থানে লেখা হয়েছে, ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ২৫০০ বছর পূর্বের জৈন দর্শনের সত্যাসত্য তত্ত্বের প্রতিলিপি মাত্র।[১৫] শুধু তাই নয়, জৈন শ্রমণদের জীবের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনেক দিক থেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ বা বর্তমান জেনেটিক সায়েন্সের সঙ্গে এক। তবে ডারউইনের সঙ্গে জৈন দর্শনের কেবল একটি মূল পার্থক্য - ডারউইনের মতে জীবের ক্রমবিকাশের মূল কারণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবিত থাকার প্রয়াস আর জৈন দর্শনের মতে জীবের ক্রমবিকাশের মূল উদ্দেশ্য সর্বজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভের জন্য বিশুদ্ধ চেতনা প্রাপ্তি।[১৬]

সমস্ত 'ভারতীয় বিদ্যা সার-১' বইটির দ্বিতীয় অধ্যায় জুড়ে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে অনেক কল্পকাহিনি। এই বইয়ের মতে, ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক জন ফ্রেডরিক ড্যানিয়েলকে ১৮৩৬ সালে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির আবিষ্কার বা ১৭৫২ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ আবিষ্কারের শ্রেয় দেওয়া ভুল, কারণ বৈদিক ঋষি মহর্ষি অগস্ত্য তাঁর 'অগস্ত্য সংহিতা' গ্রন্থে ব্যাটারি দিয়ে বিদ্যুৎ উত্পাদনের কথা লিখে গিয়েছেন।[১৭] কেবল তাই নয়, নিউটনের গতিবিদ্যার তিনটি সূত্র আসলে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহর্ষি কণাদ আবিষ্কার করেছেন[১৮] আর 'সমরাঙ্গণসূত্রধার' গ্রন্থে হাইড্রলিক মেশিন (টারবাইন) ব্যবহার করে জলের ধারা থেকে শক্তি উত্পাদনের কথা লেখা আছে[১৯]। ১৯০৩ সালে রাইট ভাইরা মোটেই প্রথম উড্ডয়নের মাধ্যমে বিমান প্রযুক্তির সূত্রপাত করেননি, বৈদিক কালে, আনুমানিক ৫০০০ বছর আগে, মহর্ষি ভারদ্বাজ রচিত 'যন্ত্রসর্বস্ব' নামের একটি গ্রন্থের অংশ 'বৈমানিক শাস্ত্র'। এই গ্রন্থে, সত্য ও ত্রেতা যুগের ২৫ রকমের বিমান, দ্বাপর যুগের ৫৬ রকমের বিমান ও কলি যুগের ২৫ রকম বিমানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই বিমান শাস্ত্রের ভিত্তিতেই নাকি ১৮৯৫ সালে শিবধর বাপুজি তালপড়ে (অর্থাৎ শিবকর বাপুজি তলপদে) বিমান

উড়িয়ে দেখিয়েছিলেন।[২০] এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ বৈদিক ঋষি পারাশর আবিষ্কার করেছেন।[২১] জীবকোষের আবিষ্কার রবার্ট হুক নয়, এও মহর্ষি পারাশরের আবিষ্কার। রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে জীবকোষ দেখতে পাওয়ার কয়েক হাজার বছর আগে মহর্ষি পারাশর যখন তাঁর 'বৃক্ষ-আয়ুর্বেদ' গ্রন্থে যখন উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয়ই তখনও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল।[২২] মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ১৬৬৬ সালে নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন বলে তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া হলেও, কয়েক হাজার বছর পূর্বের ঋগ্বেদে মাধ্যাকর্ষণের উল্লেখ রয়েছে, এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রকে ভাস্করাচার্যের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র বলা ঠিক হবে।[২৩]

এবার, ভারতীয় বিদ্যা ভবন থেকে প্রকাশিত 'ভারতীয় বিদ্যা সার-২' নামের পাঠ্যপুস্তকটি থেকে ছদ্ম-ইতিহাসের কিছু উদাহরণ দেখা যাক। এই পাঠ্যপুস্তকটিও তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত – 'সর্বদর্শন', 'ভাষাশাস্ত্র এবং সংস্কৃত সাহিত্য' এবং 'কলাসমূহ'। প্রথম অধ্যায়ের এক জায়গায় বলা হয়েছে, বুদ্ধের জন্মের পূর্বেই ভারতে ষড় দর্শন সংস্থাপিত হয়েছিল।[২৪] দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি ধারা – বৈদিক ও লৌকিক; বৈদিক ধারা অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান।২৫ আর এক জায়গায় লেখা হয়েছে, কালিদাস মেঘদূতে মেঘের উৎপত্তির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় তাঁর রসায়নশাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান ছিল।২৬ এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে 'সঙ্গীতকলা' অংশে ভারতের ইতিহাসের এক নতুন কাল বিভাজনের পরিচয় পাওয়া যায় – পৌরাণিক যুগ বা প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। বলা হয়েছে, পুরাণ কথাটির অর্থ প্রাচীন। পৌরাণিক যুগের অধ্যয়নের মাধ্যমেই কেবল ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তবিক জ্ঞান লাভ হয়। সেই কারণে এ কথা মানা হয়, যে পুরাণের দ্বারাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের তথ্য জানতে পারা যায়।[২৭] 'ভারতীয় বিদ্যা সার-২' বইটি থেকে ছদ্ম-বিজ্ঞানেরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের 'বাস্তুকলা' অংশের লেখকের মতে, যে কোনও ব্যবসায় উন্নতির জন্য প্রয়োজন উত্পাদিত পণ্যের গুণমান, ক্রেতার প্রতি ব্যবহার, মালিকের ভাগ্য আর কার্যস্থলের বাস্তু। এখানে ব্যবসায় সাফল্য লাভের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কার্যস্থলের বাস্তুসম্মত দিক নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, রাজনৈতিক দলের কার্যালয়, ধুরন্ধর ব্যবসায়ী ও চলচ্চিত্র অভিনেতার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে পূর্ব দিক। আবার, এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে, ব্যবসার স্থলের উপর যদি কোনও উঁচু বাড়ি বা উড়ানপুলের ছায়া পড়ে, তাহলে কিন্তু সাফল্য আসবে না।[২৮]

ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতি শিক্ষাক্রমের এই পাঠ্যপুস্তকদ্বয় ভারতের তরুণ প্রজন্মের চেতনা থেকে বিজ্ঞান ও বিশ্বাস এবং ইতিহাস ও পুরাকথার মধ্যে পার্থক্য

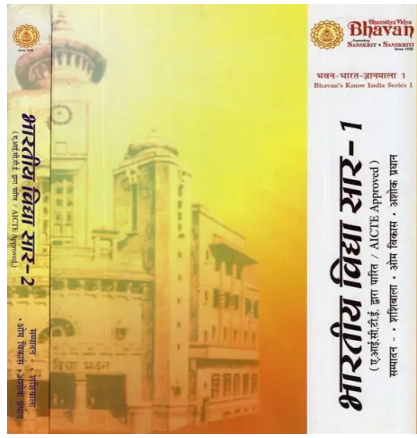

করার জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তিবোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে সক্ষম। তার চেয়েও বড়ো কথা, ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতি শিক্ষাক্রমের প্রচলনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার অর্জিত জ্ঞানকে যেভাবে ভারতীয় ও বিদেশী, দুই অর্থহীন ভাগে বিভাজন করে এক কল্পিত বিরোধাভাসের জন্ম দেওয়া হয়েছে, তার পরিণামে ভারতের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্ত যুক্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রতিই প্রবল সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। এ কথা বললে ভুল হবে না, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কার্যত ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির পাঠক্রমের নামে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নতুন উদ্ভাবিত ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাক-উপনিবেশিক দেশজ শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে কোনও মিল নেই। দেশজ শিক্ষা পদ্ধতিতে একটি বিষয় শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ অধিগত না হওয়া পর্যন্ত দিনের পর দিন ধরে পুথি পাঠ, তার ব্যাখ্যা ও অভ্যাসের যে ধারা প্রচলিত ছিল[১৯] তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

‘কোথাও নেই প্রজন্ম’

ভারতের নতুন শিক্ষা নীতির পাঠক্রম হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আজ বিশাল সংখ্যক তরুণ প্রজন্মকে যেভাবে ‘কোথাও নেই প্রজন্ম’ (‘নোহোয়ার জেনারেশন’) হওয়ার দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে, তার পরিণামে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক স্তরে যুক্তিপূর্ণ ও কার্যকর শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন গড়ে তোলা ছাড়া এই পরিস্থিতির প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

টীকা

১. “Over 50% Indians are active internet users now; base to reach 900 million by 2025: report” in ‘The Hindu’; May 04, 2023.

২. Ciara Nugent, “WhatsApp’s Fake News Problem Has Turned Deadly in India. Here’s How to Stop It” in ‘Time, August 1, 2018’; [https://time.com/5352516/in-

dia-whatsapp-fake-news/]

৩. 'List of Rationalised Content in Textbooks for Class X'; New Delhi: National Council of Educational Research and Training, May 2022, p. 19.

৪. Sanskriti Falor, "Gujarat man poses as ISRO scientist who designed Chandrayaan 3 lander; arrested" in 'Hindustan Times'; August 30, 2023.

৫. সংস্থার ফেসবুক পৃষ্ঠায় ২০২৩ সালের ১২ এপ্রিলের এই বিষয়ক পোস্টের সংযোগ শৃঙ্খল: https://www.facebook.com/bhishmaiks/posts/pfbid0z8JTEwXqXSGveam9S43RsQX4LghLrQjvsXh5136pApo9kzyJuhfmh4PUmZBzP5fzl?__cft__[0]।

৬. https://web.archive.org/web/20230325044839/https://www.bhishmaindics.org/vimanvidya (ইন্টারনেট আরকাইভ ওয়েব্যাক মেশিন ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত এই স্ন্যাপশটটি ২৫.০৩.২০২৩ তারিখে নেওয়া হয়েছিল)।

৭. 'National Curriculum Framework for School Education'; New Delhi: Secretary, National Council for Educational Research and Training, 2000, p. 13.

৮. 'National Education Policy 2020'; Ministry of Human Resource development, Government of India [https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/National_Education_Policy_2020_en.pdf].

৯. 'Guidelines for Incorporating Indian Knowledge in Higher Education Curricula'; New Delhi: University Grants Commission, March 2023, p. 6.

১০. Ibid, pp. 10-15.

১১. Pranay Kumar, "Impactful Initiative by UGC: Reviving the Indian knowledge system" in 'Organiser'; July 23, 2023.

১২. 'Model Curriculum for Undergraduate Degree Courses in Engineering and Technology (Volume II)'; New Delhi: All India Council for technical Education, January 2018, pp. 118-119.

১৩. শশিবালা, ওম বিকাস ও অশোক প্রধান সম্পাদিত, 'ভারতীয় বিদ্যা সার-১'; নঈ দিল্লি: ভারতীয়

বিদ্যা ভবন, ২০১৮, পৃ. ৬৬।

১৪. তদেব, পৃ. ৭৫।

১৫. তদেব, পৃ. ৭৯।

১৬. তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪।

১৭. তদেব, পৃ. ৯০।

১৮. তদেব, পৃ. ৯২।

১৯. তদেব, পৃ. ৯৪-৯৫।

২০. তদেব, পৃ. ৯৫-৯৭।

২১. তদেব, পৃ. ১০৬।

২২. তদেব, পৃ. ১০৬-১০৭।

২৩. তদেব, পৃ. ১০৯-১১১।

২৪. শশিবালা, ওম বিকাস ও অশোক প্রধান সম্পাদিত, 'ভারতীয় বিদ্যা সার-২'; নঈ দিল্লি: ভারতীয় বিদ্যা ভবন, ২০১৮, পৃ. ১৩৫।

২৫. তদেব, পৃ. ১৭৬।

২৬. তদেব, পৃ. ১৮৩।

২৭. তদেব, পৃ. ১৯৭।

২৮. তদেব, পৃ. ২৮৮-২৮৯।

২৯. পরমেশ আচার্য, 'বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা'; কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২০২-২০৩।

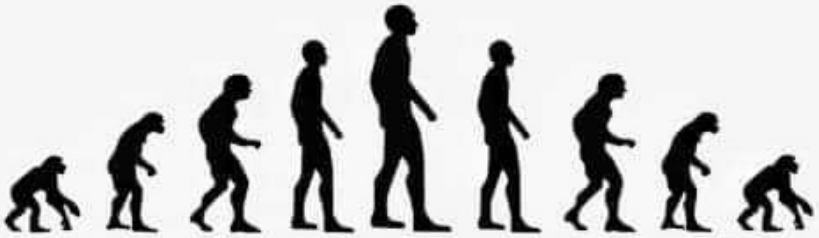

BJP

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর
আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা -

যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তত ৩টে প্রকল্প সমীক্ষা এবং প্রকল্পগুলোর সামাজিক গুরুত্ব এবং সমস্যা
অন্তত ৮ মাস
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনটে প্রকল্প ১। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ২। কন্যাশ্রী ৩। সবুজসাথী নিয়ে রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় বাংলা মধ্য বাংলা আর তরাই বাংলায় বিস্তৃত সমীক্ষা।
কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। আশাকরি আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে শুরু করতে পারব।

১০। গ্রন্থাগার প্রকল্প
৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেনে গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি খোলা

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চাই নি, চেয়েছি চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ আজকের বাস্তবতায়, আজকের আলোচনার টেবলে ফেলতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনা আদিত্য নিগমের সঙ্গে এবং চলতি সংখ্যায় লুঠেরা খুনি গণহত্যাকারী ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - ‘কি করিতে হইবে (না)’
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম